বলদেবতত্ত্ব

ও

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)

ঈশোদ্যান

পোঃ-শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবলদেবতত্ত্ব

ও

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
অনুকম্পিত এবং

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ
প্রবর্ত্তিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পারমার্থিক পত্রিকার
প্রাক্তন সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী
(ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ)
প্রণীত

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

তৃতীয় সংস্করণ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত **"শ্রীচৈতন্যবাণী"** প্রেস হইতে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি

২৯ শ্রীধর, ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দ
১৯ শ্রাবণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
৫ আগষ্ট, ২০০৯ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া
পিন্-৭৪১৩১৩

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কোলকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ-আগরতলা ৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

উপোদ্‌ঘাত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত—আমাদের সতীর্থ ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এ (দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম—শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী) মহোদয়ের বিশেষ সৌজন্যে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মুখপত্র 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তল্লিখিত যে "শ্রীবলদেব-তত্ত্ব" এবং "শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার" শীর্ষক কএকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই উক্ত পত্রিকার কতিপয় সারগ্রাহী গ্রাহক সজ্জনের বিশেষ অনুরোধে বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমাদের আরও ইচ্ছা আছে যে, মুদ্রণব্যয় সংগৃহীত হইলে তাঁহার "শ্রীমদ্ভাগবত-রহস্য", "শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব" প্রভৃতি অপর প্রবন্ধগুলিকেও আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার বাবুর স্বলিখিত একটি অসম্পূর্ণ জীবন চরিত হইতে পবিত্র জীবন সম্বন্ধে কএকটি কথা আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষিপ্তাকারে এই ভূমিকায় সন্নিবেশিত করিতেছি।

নানা ঘাতপ্রতিঘাতময় অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে সরলতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ডাক্তার বাবু বিনা আড়ম্বরে কত সাধারণ ভাবে তাঁহার জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কিপ্রকার অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সর্ব্বহারা ম্রিয়মাণ মনুষ্যসমাজের শিক্ষণীয় আদর্শ উজ্জীবন-স্বরূপ। বিশেষতঃ তাঁহার পারমার্থিক জীবন-সম্বন্ধেও অপূর্ব্বতত্ত্বানুভূতি, মহাজনানুসৃতভজন-বিজ্ঞানবেত্তৃত্ব, নামভজনানুকূল তৃণাদপি-সুনীচত্ব-তরোরপিসহিষ্ণুত্ব-অমানিত্ব-মানদত্বাদি অবশ্যলভ্য-গুণচতুষ্টয়-সমৃদ্ধত্ব, ভজনানুরাগ, পর-দুঃখকাতরতা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-তৎপরত্বাদি মহত্ত্ববিজ্ঞাপক সদ্‌গুণসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আদর্শস্থানীয়।

ডাক্তার বাবু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে কোন এক রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাহিরদিয়া নামক একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতৃহারা এবং ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহারা হন। তাঁহার পিতার নাম ছিল—শ্রীসীতানাথ ঘোষ। তাঁহার জনক-জননী—উভয়েই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী এবং মহদন্তঃকরণ ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলমূর্ত্তিপূজায় অত্যধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রেও বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধা শ্রদ্ধা দেখা যাইত। তাঁহার শ্রীযুগলমূর্ত্তির স্তবস্তুতি পাঠ ও পূজার মন্ত্রাদি শুদ্ধভাবে উচ্চারণের যোগ্যতা দেখিয়া সংস্কৃত-শিক্ষক পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া ডাক্তার বাবু তাঁহার ছাত্র-জীবনে সংস্কৃতভাষাচর্চ্চাদ্বারা তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সংস্কৃত ভট্টিকাব্যের ১ম ও ২য় সর্গের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণসহ একটি সুন্দর সংস্করণ প্রণয়ন করেন। ২য় সর্গে ব্যাকরণের জটিলতা অত্যধিক। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অধ্যাপকগণ ঐ সংস্করণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। উক্ত ভট্টিকাব্যের টীকা আই-এ ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

স্বনামধন্য সর্ব্বজনমান্য ডাঃ পি সি রায় মহাশয় ডাক্তার বাবুকে খুবই স্নেহ করিতেন এবং অনেক সদুপদেশ দিতেন। কিছুদিন তাঁহাকে তাঁহার নিকট রাখিয়াও ছিলেন। ডাক্তার বাবুর প্রশস্ত ললাট দর্শনে ডাক্তার রায় তাঁহার অন্যান্য ছাত্রগণকে বলিতেন—'দেখ্ ওর কেমন বিদ্যাসাগরী খোলা কপাল, তোরা দেখ্‌বি ও' ভবিষ্যতে একটা মানুষ হ'বে.........ইত্যাদি।' তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য-সত্যই অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছে।

অসৎসঙ্গ ত্যাগে তিনি বাল্যকাল হইতেই বিশেষ সাবধান ছিলেন, তাই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সর্ব্বদাই দুঃসঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বি-এ পাশ করিবার পর তিনি সদ্বংশসম্ভূতা ধর্ম্মপত্নী স্বীকার করেন।

তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাহিরদিয়া হাইস্কুল হইতে এন্ট্রান্স, ১৯১১ সালে নড়াইল কলেজ হইতে আই-এ, ১৯১৩ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে বি-এ এবং ১৯১৫ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ল-কোর্সও কম্প্লীট করেন; কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় তাঁহার কোন আগ্রহ না থাকায় ফাইন্যাল পরীক্ষা দেন নাই। অতঃপর ডাক্তার বাবু একবৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকরী করিবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার অফিসে চাকরী পান। এই চাকরী সময়ে তিনি 'রেগুলার হোমিওপ্যাথিক কলেজ' ও 'য়্যালেন রয়্যাল হোমিও কলেজে' ৫ বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ৫।৭ বৎসর রায় চৌধুরী কোম্পানীতে বসিয়া সকালে ও রাত্রে উপস্থিত রোগীদের চিকিৎসা করিতে থাকেন। তৎপ্রতি রোগীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় তিনি ঐ ঔষধালয় ছাড়িয়া খৃ ১৯২৪ সালে বৌবাজারে—'ওয়ার্কার হোমিও হল' নামে একটি নিজস্ব চেম্বার ও ফার্ম্মেসী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ চাকরীকালে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের কথা জানিয়াও তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই, বরং উৎসাহই দিয়াছেন। কেননা অফিসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ রোগীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি অবসর-গ্রহণকালের ৬ বৎসর পূর্ব্বেই ১৯৪৬ সালে ইউনিভারসিটীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি বহু হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেট্ ফ্যাকাল্টি অফ হোমিওপ্যাথির সভাপতি

নির্ব্বাচিত হন। আশুতোষ হোমিও কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং বেঙ্গল হোমিও ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু 'হ্যানিমান প্রকাশিকা' নাম্নী একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সম্পর্কিত কএকখানি মূল্যবান্ পুস্তকও প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত 'কলেরা চিকিৎসা', শিশু-রোগ-চিকিৎসা' ও 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', গ্রন্থগুলি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিশেষ আদরণীয় হয়।

মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই ডাক্তার বাবুর অন্তরে পারমার্থিক জীবনে উন্নতির জন্য বিশেষ আকাঙক্ষা জাগে। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণধর্ম্মের উদারতা ও উপাসনা-প্রণালী তাঁহার কিছু ভাল লাগিলেও তাঁহাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি অবাঞ্ছিত ও অপরাধময় কটাক্ষ দর্শনে তিনি খুবই মর্ম্মাহত হন। বিশেষতঃ নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপোপাসনায় তাঁহার চিত্ত আদৌ আকৃষ্ট হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী প্রভৃতি পাঠে আনন্দ বোধ হইলেও তাঁহাদের কথার সহিত বর্ত্তমান প্রচারকগণের আচরণের সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে গিয়াও তাঁহাদের সম্প্রদায় আশ্রয় করিবার মত মনোবল লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইং ১৯২৪ সালে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্রবে আসেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য পতিতপাবন আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য বৈশিষ্ট্য দর্শনে তিনি খুবই মুগ্ধ হন। এতাবৎকাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি যেসকল সংশয়ের সমাধান খুঁজিয়া পান নাই, অধুনা সে সকলের বাস্তব সমাধান পাইয়া তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্মে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ সস্ত্রীক তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ডাক্তার বাবু ৬। ৭ বৎসর সস্ত্রীক বিশেষ অনুরাগের সহিত ভজন করেন। কিন্তু

দৈবক্রমে তাঁহার স্ত্রী সাংঘাতিকভাবে যকৃৎ রোগাক্রান্তা হইয়া পড়িলে তাঁহাকে লইয়া কিছুকাল ডাক্তার বাবুকে খুবই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। অবশেষে নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপ্রাণা ও নানা সদ্গুণালঙ্কৃতা ছিলেন। ডাক্তার বাবু এই সময়ে নানা পারিবারিক অশান্তির মধ্যে পড়িয়া কএকবৎসর যাবৎ ভজন সাধনে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইলেও ইং ১৯৫৫ সাল হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে আবার তাঁহার ভজনোৎসাহ প্রবলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়।

তিনি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ, মঠবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী এবং শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে গভীর গবেষণাপূর্ণ ভাষণাদি প্রদান ও মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি করিয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। শ্রীমঠের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায়ও প্রায়শঃই তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বার্দ্ধক্য ও পরমার্থানুরাগ বশতঃ শেষ জীবনে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় কমাইয়া দিলেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি থাকায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীদিগের একান্ত অনুরোধে তাঁহাদের চিকিৎসাদি কার্য্যে কিছু সময় ব্যয় না করিয়া পারিতেন না। তথাপি গৃহে অবস্থান-কালে অধিকাংশ সময়ই তিনি প্রত্যহ যথানিয়মে শ্রীহরিনাম-গ্রহণ, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও প্রবন্ধ-লিখনাদি ভগবদনুশীলনকার্য্যে ব্যয় করিতেন। প্রত্যহ অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন বা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে বৈষ্ণবোচিত প্রায় যাবতীয় সদ্গুণই তাঁহাতে বিরাজিত ছিল। তাঁহার শান্তস্নিগ্ধ মধুর মূর্ত্তি, বিনয়নম্র ব্যবহার, পরোপচিকীর্ষা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা-দ্বারা অর্থাদির সদ্ব্যবহার করিবার

আদর্শ, মাদৃশ অযোগ্য জীবাধমের প্রতি স্নেহাধিক্য—অযাচিত করুণা প্রভৃতি অদ্যাপি স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া হৃদয়খানিকে বড়ই উদ্বেলিত করিয়া তুলে, তাঁহার ন্যায় প্রিয়তম বান্ধবের অভাব বড়ই মর্ম্মন্তুদ ও অসহনীয় বলিয়াই অনুভূত হয়।

বিগত ৭ দামোদর, ৪৭৮ গৌরাব্দ; ১১ কার্ত্তিক, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ বুধবার ডাক্তার বাবু শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাবদিবস—শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৫ ঘটিকায় ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার ২০ নং ফার্ণপ্লেস, বালীগঞ্জস্থিত নিজ বাসভবনে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক স্বাভীষ্ট শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরুপদান্তিকে নিত্যবাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্ববৎসর পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যসহ ব্রজমণ্ডল - পরিক্রমাকালে ঠিক উক্ত শ্রীরাধাকুণ্ড - প্রকটবাসরে শ্রীবহুলাষ্টমীতিথিতে শ্রীরাধকুণ্ডতটে অবস্থান পূর্ব্বক ডাক্তার বাবু ভজন করিয়াছেন এবং মধ্যরাত্রে শ্রীকুণ্ডাবির্ভাবকাল স্মরণমুখে রাত্রিকালে মাদৃশ জীবাধমকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকুণ্ড-পূজা-নতি-স্তুত্যাদি করিয়া আসিয়াছেন। পরবৎসর ঠিক ঐ পবিত্র তিথিতেই মহাপ্রয়াণ করায় পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব তাঁহার দিব্যানুভূতিতে শ্রীসুজনানন্দ প্রভুর শ্রীরাধাদাস্যে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির নিঃসংশয়িত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

ডাক্তার বাবু তাঁহার অপ্রকটকালে দুই কৃতীপুত্র এবং ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ দক্ষিণ আফ্রিকা ঘানায় চিকিৎসকের কার্য্য এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরবীন্দ্র কুমার ঘোষ আই-এ-এস্ পাশ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কার্য্য করেন। তাঁহার ছয় কন্যা—শ্রীমতী কল্যাণী দে, শ্রীমতী করুণা বসু, শ্রীমতী অর্চ্চনা কর, শ্রীমতী

অরুণা কর, শ্রীমতী অপর্ণা বসু ও শ্রীমতী সুমিতা ঘোষ। পুত্র কন্যা সকলেই পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পরায়ণা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে পরিচালিত দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের সহসভাপতিরূপে বৃত হইয়া ডাঃ ঘোষ উক্ত বিদ্যামদিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারোদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ নামক যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন, উক্ত বিদ্যাপীঠের সম্পাদকরূপে উহার সমৃদ্ধির জন্য শেষ দিন পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার তিনি ছিলেন—'সম্পাদক-সঙ্ঘপতি'। তিনি বাহ্যতঃ গৃহে অবস্থান করিলেও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ছিল তাঁহার জীবাতু-স্বরূপ, শ্রীমঠের সেবৌজ্জ্বল্য সম্পাদন-চিন্তায় তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন নিষ্কপটে তাঁহার প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য—সর্ব্বস্ব। তাই তাঁহার অপ্রকটে পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব অত্যন্ত বিচলিত—বিরহবেদনা-ক্লিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—'তাঁহার অভাব অপূরণীয়, আমাদের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত নিষ্কপট স্নেহ স্মরণ করিলে চিত্ত বড়ই বিচলিত হইয়া উঠে।'

শ্রীপাদ সুজনানন্দ প্রভু তাঁহার 'শ্রীবলদেবতত্ত্ব' প্রবন্ধে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবতত্ত্ব বর্ণন পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীবলদেবই যে শ্রীগৌরলীলায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে এবং "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার" প্রবন্ধে স্বয়ংরূপ স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বাবতারাবতারী সর্ব্ব-অংশী অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

মূল বিষয়বিগ্রহ পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে তদীয় আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি স্বরূপশক্তি মহাভাব-স্বরূপিণী (হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব, ভাবের পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, সেই মহাভাব-স্বরূপিণী) শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি সুবলিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণাবলম্বনে প্রতিপাদন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাবতারের গূঢ় রহস্য মহাজনানুগত্যে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধদ্বয় ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ তাঁহাদের নাম রূপ ও পরমোদার লীলা সম্বন্ধে বহু সাত্বত-শাস্ত্রসম্মত, মহাজনানুমোদিত অবশ্য-জ্ঞাতব্য সিদ্ধান্ত ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন! আমরা সারগ্রাহী সজ্জন-সমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

গ্রন্থখানির মুদ্রণানুকূল্য করিয়াছেন—ডাঃ ঘোষের প্রথম পুত্র ডাঃ শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌর-নিত্যানন্দপাদপদ্মে সগোষ্ঠী তাঁহার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করি। এই গ্রন্থপ্রকাশ দ্বারা তিনি তাঁহার গোলোকগত পিতৃদেবের তৃপ্তিবিধান-রূপ প্রকৃত পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভগ্নীবৃন্দসহ সকলেই নিঃসংশয়িতভাবে তাঁহার প্রচুর স্নেহাশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন। অলমতিবিস্তরেণ। নিবেদন ইতি—

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর
তিরোভাব তিথি
৪ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

নিবেদন

'শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার' শীর্ষক বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত-তত্ত্বপূর্ণ এই মহামূল্য গ্রন্থখানির প্রণেতা—শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদ্‌বিশ্বব্যাপী শাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য আচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত এবং সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদ-প্রবর্ত্তিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—আমাদের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সতীর্থ শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী (ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এ) প্রভু। এই গ্রন্থরত্নের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় — পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামি মহারাজের প্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা শুভবাসরে—২৯ নারায়ণ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ, ১৫ পৌষ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ তৎকালে পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামি-মহারাজের সেক্রেটারী ছিলেন। বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য, তাঁহারই সম্পাদকত্বে উক্ত গ্রন্থরত্নের সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিজজন পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ আমাকে খুবই ভালবাসিতেন। তাঁহারই ইচ্ছায় আমি উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের উপোদ্‌ঘাত নামে একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলাম, তাহা উক্ত গ্রন্থে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর তিরোভাববাসরে—৪ঠা পৌষ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ এবং ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ সুজনানন্দ প্রভুর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঐ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। তিনি ১৯২৪ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্রবে আসেন, মনে হয় ঐবৎসরেই তিনি সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে তাঁহার দীক্ষা হয়,

পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ঐ দিবস শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার একস্থানে লিখিত আছে, উভয়ের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা ছিল।

বাস্তববস্তুতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিদ্বৎসমাজে এই গ্রন্থরত্ন বিশেষভাবে সমাদৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বস্তুতঃ উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে যত্ন না থাকিলে ভজননৈপুণ্য লাভ করা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।' এজন্য আমরা এই গ্রন্থরত্নের বহুলপ্রচার অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। অবশ্য অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তগণের পক্ষে এই গ্রন্থ-স্বারস্যের উপলব্ধি সহজসাধ্য না হইলেও ভজনবিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের নিকট হইতে উহার অর্থ শ্রবণ করিয়া অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ ভজন-বিজ্ঞতা বা ভজন-চাতুর্য্য লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করতঃ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

এই গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে আমাদের আত্যন্তিক স্নেহাস্পদ ভক্তপ্রবর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমান্ ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম অবর্ণনীয়। তিনি যে পরমারাধ্য প্রভুপাদ এবং তাঁহার নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ও তাঁহার অভিন্ন সুহৃদ্বর পূজ্যপাদ সুজনানন্দ প্রভুর অফুরন্ত স্নেহাশীর্ভাজন হইতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৃহৎমৃদঙ্গসেবায় যত্ন করিয়া বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্যপাদেরও তিনি প্রচুর স্নেহভাজন হইতেছেন। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সুস্থ সেবাকৃত্যকুশল সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা
৩০ নারায়ণ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ;
১৩ মাঘ, ১৪০০; ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

শ্রুতির বাক্য হইতে এরূপ জানা যায় যে পরব্রহ্মের বিগ্রহ বা আকার নিত্য। তিনি যে সৃষ্টিলীলার জন্য বিগ্রহবান্ হইলেন তাহা নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি বিগ্রহবান্ ছিলেন। শ্রুতিতে যেখানে তাঁহাকে 'অরূপ', 'অমূর্ত্ত', বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে তাঁহার আকার 'মায়িক' নহে এজন্য মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা গ্রাহ্য নহে। শ্রুতিতে ইহাও জানা যায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার বিগ্রহ ছিল অনন্ত। সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অনন্ত—এই তিনটি অনন্ত-বস্তুরসমবায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ পুরুষমূর্ত্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।" (বৃহদারণ্যক)। তখন তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিই ছিল। যখন তিনি লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি তাঁহার অনন্ত সৎ, চিৎ, আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া নরমূর্ত্তির যে পরিমাণ সেই পরিমাণ হইলেন—ইহাই তাঁহার সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। শ্রুতি বলিতেছেন— "স বৈ নৈবরেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ" (বৃহদারণ্যক)—অর্থাৎ তিনি (পরব্রহ্ম) একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই পরিমাণ হইলেন, যেমন পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষে হয়। তিনি এই আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই শ্রুতিবাক্যে বুঝা যাইতেছে যে পরব্রহ্ম আনন্দ-লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন—তাঁহার একাকীত্ব তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একাকী লীলা সম্ভব নয়, সেজন্য লীলা করিবার জন্য তাঁহার লীলাপরিকর আবশ্যক।

পরব্রহ্ম নিত্যকাল সচ্চিদানন্দ পুরুষমূর্ত্তি

তিনি নরাকার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ

এজন্য তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিকে সান্দ্রীকরণের দ্বারা নিজেকে মানবপরিমাণ ক্ষুদ্রাকার করিয়া যে সমগ্র স্থান তিনি অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিতে ব্যাপিয়া ছিলেন সেই স্থানকে তিনি শূন্য করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই স্থান অনন্ত পুরুষমূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল সেজন্য এই স্থান অনন্ত।

এই অনন্তশূন্যস্থানের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ পরব্রহ্ম তাঁহার সন্ধিনীশক্তিকে বিস্তার করিয়া অপ্রাকৃত পরব্যোম প্রকাশ করিলেন, এই অপ্রাকৃতপরব্যোমেই শ্রীভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি প্রকাশিত। ত্রিপাদ বিভূতি প্রকাশের পর শূন্যস্থানের মধ্যেই তাঁহার মায়াশক্তির পরিণামভূত বিস্তারের দ্বারা প্রাকৃত বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন। এই প্রাকৃতবিশ্বে তাঁহার একপাদ বিভূতি প্রকাশিত। পরব্যোম, গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামের আকাশ—ইহা সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ বলিয়া ইহা চিন্ময় বস্তু। এই ব্যোম অর্থাৎ আকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া ইহাকে পরব্যোম বা মহাকাশ বলা হয়। প্রাকৃতবিশ্বে যে আকাশ আমরা দেখিতে পাই, উহা মায়াশক্তির পরিণাম, সেজন্য উহা প্রাকৃত জড়বস্তু।

পরব্রহ্ম লীলার জন্য সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ হইবার পূর্ব্বে কতকাল একাকী অনন্ত পুরুষরূপে ছিলেন তাহা বলা যায় না, কারণ মায়াশক্তির গতিই কাল। প্রাকৃত সৃষ্টিলীলার পর হইতে মায়াশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে কালের আরম্ভ। শ্রুতিতেও এই তত্ত্বসূচক বাক্য রহিয়াছে "ন হ পুরাততঃ সংবৎসর আস" (বৃ-আ)—প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে সংবৎসর অর্থাৎ কাল ছিল না। পরব্রহ্মের অনন্তরূপের পরিচয় আমরা এইভাবে পাইতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি অনন্তস্থান ব্যাপিয়া ছিলেন, সৃষ্টিলীলার জন্য তিনি তাঁহার অনন্ত পুরুষ-মূর্ত্তিকে সান্দ্রীকরণের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ নরাকার পুরুষমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন, তাঁহার সন্ধিনীশক্তি প্রকাশরূপ অপ্রাকৃত পরব্যোম

অপ্রাকৃত
ধাম সমূহ প্রকাশ

এবং সেখানে তাঁহার স্বরূপগণের প্রকাশ, স্থাবর জঙ্গমসহ প্রাকৃতবিশ্ব তাঁহার মায়াশক্তির পরিণাম, সুতরাং তাঁহার অনন্তরূপের পরিচায়ক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি লীলা করিবার জন্য সান্দ্রীকরণের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহরূপে নরাকৃতি হইয়াছিলেন। এই আকারটি কিরূপ? শ্রুতি বলেন "গোপবেশম্ অভ্রাভং তরুণংকল্পদ্রুমাশ্রিতম্" (গোপালতাপনী)। এই শ্রুতিই অন্যস্থানে বলিতেছেন "সৎ-পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্"—এই সবিশেষরূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ নিত্যকিশোর (তরুণং), মেঘবর্ণ (মেঘাভং), বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিহিত (বৈদ্যুতাম্বরং), কমলনয়ন (সৎপুণ্ডরীকনয়নং), বনমালাধারী (বনমালিনং) ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ বলেন—"নরাকৃতিং পরব্রহ্মং"—পরমব্রহ্ম নরাকৃতি।

পরব্রহ্মের নরাকার কিরূপ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।।

ভাঃ ৩। ২। ১২

"ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি নরলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়, তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।।

কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি পরব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার লীলা, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারলীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় শ্রীভগবানের ক্রীড়াসমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে নরলীলাই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণস্বরূপ নরলীলার সদৃশ কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত দোষ বিশিষ্ট নহে।

এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি মূলবস্তু। তাঁহার স্বরূপের যেমন এই তিনটী মূলবস্তু, তাঁহার স্বরূপশক্তিতেও সেইরূপ তিনটি বিভেদ আছে—'সৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সন্ধিনী, 'চিৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রীশক্তি 'সম্বিদ্' এবং 'আনন্দ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'হ্লাদিনী'। অনাদিকাল হইতে এই সচ্চিদানন্দতত্ত্বের শক্তির বিকাশ কোন আবির্ভাবে আংশিকভাবে ব্যক্ত এবং কোন আবির্ভাবে পূর্ণতমভাবে ব্যক্ত। যে আবির্ভাবে ঐ সকল শক্তির পূর্ণতম বিকাশ তাহাই তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি সবিশেষরূপ। তাঁহার এই স্বরূপের মধ্যে 'সৎ'— 'চিৎ' ও 'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যূত, চিৎ 'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যূত এবং 'আনন্দ' 'চিৎ' এর দ্বারা অনুস্যূত—এইরূপ অনুস্যূত সৎ-চিৎ-আনন্দ পরস্পরের মধ্যে থাকিলেও একটী সম্মিলিত বস্তু। এজন্য তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বাংশেই জ্ঞানশক্তিযুক্ত চিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তিযুক্ত আনন্দ আছে এবং তাঁহার সকল অঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত। যে কোন অঙ্গের দ্বারাই তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন। এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই তাঁহার নরাকারস্বরূপ। কিরূপ আকার তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আবার শ্রুতি বলিতেছেন 'রসো বৈ সঃ', (তৈত্তিরীয়)। 'রস' বলিতে তিনি আস্বাদক (রসয়তি-আস্বাদয়তি)—তিনি ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও তাঁহাকে রসিকশেখর বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস আস্বাদক রসময় কলেবর" (মধ্যে) তাঁহার স্বরূপস্থিত হ্লাদিনীশক্তিও তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি নিজেই আনন্দঘনমূর্ত্তি 'অখিল রসামৃতসিন্ধু' বলিয়া পরম আস্বাদ্য বস্তুও তিনি (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ) তিনি

তিনি রসস্বরূপ

লীলাপরায়ণ — নিজে আত্মারাম হইয়াও তিনি হ্লাদিনীর প্রেরণায় আনন্দাতিশয্যে সর্ব্বদা লীলাপরায়ণ। শ্রুতিতে বলিয়াছেন "কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্" (গো-তা)—দিব্ ধাতু অর্থে দ্যুতি বা ক্রীড়া দুইই বুঝায়,তিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ তাঁহার কলেবর জ্যোতির্ম্ময়। তিনি ক্রীড়া (লীলা, কেলি) করেন—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্"। সুতরাং আমরা পাইলাম দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যকিশোর নবজলধর-শ্যামবর্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দর পরম জ্যোতির্ম্ময় এবং পরম ক্রীড়াপরায়ণ। "স একাকী ন রমতে"—একাকী ক্রীড়া করিয়া তিনি আনন্দ পান না। তাহাতে বুঝিলাম তাঁহার লীলার জন্য পরিকর আবশ্যক। তিনি ও তাঁহার ক্রীড়া যখন অনাদি, তাঁহার লীলাপরিকরগণও অনাদি,—অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় নিজস্বরূপকে বিস্তার করিয়া তাঁহার লীলাপরিকর স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি" (গো-তা)—তিনি এক (অদ্বিতীয়) হইয়াও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সমস্ত রসের আশ্রয় তিনি—"সর্ব্বরসঃ" (ছান্দোগ্য), সেজন্য এই বিভিন্ন রস আস্বাদনের জন্য তাঁহার পিতা, মাতা, সখা, কান্তা প্রভৃতি বিভিন্ন রসাস্বাদনোপযোগী বিভিন্ন লীলা-পরিকর আবশ্যক। মধুর রসের মধ্যে সর্ব্ববিধ রস অনুস্যূত থাকায় যেখানে সেই

তিনি লীলাপরায়ণ

রসের পূর্ণতম ভাবে অভিব্যক্তি সেই ব্রজধামই সর্ব্বরস কৃষ্ণের প্রধান লীলাস্থান। সেজন্য তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। যদি কেহ বলেন পরব্রহ্ম নরাকার হইলে সীমাবদ্ধ হয়েন কি না? তাহার উত্তর তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম—তিনি, "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—হইলেও তিনি ক্ষুদ্রাকার, মধ্যমাকার, বিরাটাকার সবই হইতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্"—সমস্ত ক্ষুদ্রাকার বস্তুর মধ্যে তিনি ক্ষুদ্রতম এবং সমস্ত বিশালাকার বস্তুর মধ্যে তিনি বৃহত্তম। সুতরাং দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যতরুণ শ্যামসুন্দরের নরাকার হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে এবং তাহাতে তাঁহার বিভুত্বের হানি হয় না।

লীলার জন্য স্বরূপের বিস্তার

লীলার জন্য অনন্ত চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভগবত্তার বিস্তার করিলেন "তপস্যা চীয়তে ব্রহ্ম" (মুণ্ডক)—পরব্রহ্ম লীলার জন্য স্বীয় জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া—অর্থাৎ কিরূপে আপনাকে বিস্তার করিলে সুষ্ঠুভাবে লীলাকার্য্য হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া লইয়া নিজের বিস্তার সাধন করিলেন।

প্রথম বিস্তার—রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি

তাঁহার সর্ব্ব প্রথম বিস্তার—পূর্ব্বে উল্লিখিত "স বৈ নৈব রেমে" এই শ্রুতিবাক্য অনুযায়ী পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় নরাকৃতি। এই তত্ত্বটীর বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পুরাণাদি স্মৃতি শাস্ত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে আনন্দরস আস্বাদনের জন্য এবং উহা বিতরণ জন্য তিনি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত হ্লাদিনী শক্তিকেই মূর্ত্তিমতী করিয়া দ্বিতীয়ারূপে প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ সেই হ্লাদিনীকেই ঘনীভূত করিয়া মূর্ত্তিমতী করিলেন, শ্রীরাধিকাই তাঁহার সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর উপলব্ধিভূত ঐরূপ উক্তি—"রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ"। শ্রীরাধিকার স্বরূপ এই যে তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের পরিণতি হ্লাদিনীশক্তি—এই হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণের সহিত একীভূত ছিল, পরে কৃষ্ণ হইতে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রাধামূর্ত্তি হইলেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবানের ভগবত্তার প্রথম বিস্তার তাঁহার যুগলমূর্ত্তি—স্ত্রীপুরুষের ন্যায় পরস্পর আলিঙ্গিত মূর্ত্তি।

শ্রীভগবান তাঁহার স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিকে শ্রীরাধিকারূপে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলেও স্বয়ং হ্লাদিনীশক্তিহীন হইলেন না, কারণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত, অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (বৃ-আ)। শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশ করিবার পরও শ্রীভগবানের মধ্যে অনন্ত হ্লাদিনীশক্তি বিদ্যমান রহিল। এখন শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণ পারস্পরিক লীলাদ্বারা উভয়ে আনন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর লীলাবিস্তার জন্য শ্রীভগবান তাঁহার সন্ধিনীশক্তিকে অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতম দেশে 'কৃষ্ণলোক' রূপে নিজধাম প্রকাশ করিলেন। এই কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোলোক বা গোকুল নামক নিজধামে তিনি শ্রীরাধিকাসহ নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। লীলার

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থানগুলিকে গোলোক, গোকুল, ব্রজ, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীগোপালচম্পূ এবং হরিবংশে উহার যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে তাহার সারমর্ম্ম এই—

পরব্যোমের উর্দ্ধে সহস্রদল পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে তাহার নাম গোকুল (ব্রজধামও হয়)। উক্তপদ্মের কর্ণিকার স্থলে (পদ্মমধ্যস্থ বীজ কোষকে কর্ণিকার বলা হয়) শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর—এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদাদি ও শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণের সহিত বাস করেন। ঐ পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে (পদ্মের কেশর বা পুষ্পরেণু যেখানে থাকে) পরম প্রেমভাজন গোপগণ বাস করেন। ঐ

পরিপুষ্টি সাধন জন্য শ্রীরাধিকা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে বিস্তার করিয়া তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ তাঁহার সখাবৃন্দকে তাঁহার 'তদেকাত্মরূপ' (বিলাস ও স্বাংশ) এবং তাঁহার আবেশ অবতারগণকে প্রকাশ করিয়া বিলাস করিতে লাগিলেন, এই গোলোকেই শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় দেহ' শ্রীবলরাম মূলসঙ্কর্ষণরূপে নিত্যকাল তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন।

অন্যান্য লীলা-পরিকরগণ

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজধাম কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে স্বয়ংরূপে বিলাস করিতেছেন। এখানে তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ তাহার 'দ্বিতীয় দেহ' শ্রীবলরাম (মূল সঙ্কর্ষণ) ও মাতা, পিতা ও সখাবৃন্দকে প্রকাশ করিয়া এবং শ্রীরাধিকা, তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিলাস করিতেছেন।

পদ্মের পত্রস্থানীয় অংশে অর্থাৎ গোকুলের শেষসীমায় গোপসুন্দরীগণের উপবনসমূহ (এই সকল উপবনকে কেলিবৃন্দাবন বলা হয়) উক্ত পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্মণ্ডলভাগে গোকুলের আবরণস্বরূপ একটী চতুষ্কোণ ধাম—উহার বহির্মণ্ডলকে (শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক) এবং অভ্যন্তর মণ্ডলকে 'বৃন্দাবন' (অর্থাৎ গোকুলের অব্যবহিত পরের অংশ) বলা হয়—অর্থাৎ গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক। কেহ কেহ বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুল এই তিন নামে এক গোকুলধামকেই অভিহিত করেন—"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম।।"— চৈঃ চঃ আদি ৫। ১৭—অপ্রকটলীলায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এই তিন ধামেই লীলা করেন। 'গো-গোপাবাস' এই অর্থে গোলোক নাম। হরিবংশের মতে শ্রীবৃন্দাবন প্রকট ও অপ্রকট উভয়লীলারই স্থিতি, কিন্তু গোলোকে কেবল অপ্রকট লীলারই স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক গোকুলে অবতরণ করেন।

এখন নানাবিধ লীলা বৈচিত্রী সাধনের জন্য তিনি নিজেকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত মথুরা ও দ্বারকাতে তিনি চতুর্ব্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। ইহাই তাঁহার আদি চতুর্ব্ব্যূহ। এই চতুর্ব্ব্যূহের প্রথম ব্যূহ শ্রীবাসুদেব — ইনি দেবকীগর্ভজাত বসুদেবপুত্র এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। স্বয়ং কৃষ্ণই বাসুদেব, তিনি কৃষ্ণের অংশ নহেন, এজন্য ইনি পূর্ণতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বিভুজ, গোপবেশ ও গোপ-অভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ— তাঁহার ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয়অভিমান।

দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহ
—আদিব্যূহ

দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ— যে বলরাম স্বয়ংরূপে ব্রজে 'মূল সঙ্কর্ষণ'-রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন, তিনিই সঙ্কর্ষণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের লীলার সহায়তা করিতেছেন। বর্ণে ও অঙ্গসন্নিবেশে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুরাবিলাসী সঙ্কর্ষণে কোন পার্থক্য নাই—উভয়ই দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে—ব্রজে বলরামের গোপভাব, দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। [অপ্রকট লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেকটীতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের পৃথক্ পৃথক্ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত। প্রকটলীলায় একধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন অন্যধামে তাঁহাদের তখন কোন প্রকটরূপ থাকে না।]

মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম

তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন—ইনি শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত পূর্ণ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ।

চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ—ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র; সুতরাং ইনিও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব। এই দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ অন্য চতুর্ব্ব্যূহাদির মূল (সর্ব্ব চতুর্ব্ব্যূহঅংশী), অন্যান্য চতুর্ব্ব্যূহ ইহারই অংশ।

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় "এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়"—অর্থাৎ এই তিন লোকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াব্যতীত সৃষ্টিকার্য্যাদি অন্য কোন কার্য্য নাই, স্বীয় পরিকরগণের সহিত অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। শুধু লীলারসের বৈচিত্রী সাধনের জন্যই তিনটী বিভিন্ন ধামে লীলা করেন। [এই তিনটি ধামের লীলাতেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশিত, কিন্তু উহার তারতম্য আছে। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রধান, সেখানে যে মাধুর্য্য আছে উহা ঐশ্বর্য্যের অনুগত; মথুরায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমভাবে প্রকাশিত। কিন্তু ব্রজধামে মাধুর্য্যই প্রধান, সেখানে যদি কখনও ঐশ্বর্য্যের ভাব দেখা যায় তাহা মাধুর্য্যের অনুগত। প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সারবস্তু—"মাধুর্য্যই ভগবত্তাসার"। পরিকরদিগের প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা এজন্য এখানে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ।]

গোকুল, দ্বারকা, ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের শুধু লীলাময় স্বরূপের বিস্তার

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় স্বরূপের বিস্তার সাধন করিয়া তাঁহার অন্যস্বরূপের বিস্তার পরব্যোমে করিয়াছেন,—

পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণস্বরূপে তাঁহার নিজের আর একটী আবির্ভাব প্রকাশ করিলেন। এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। এখানে নারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের তিনটী প্রধানা শক্তি শ্রী, ভূ ও লীলা শ্রীনারায়ণের চরণসেবা করিতেছেন [শ্রীশক্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী— ইনি লক্ষ্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণদ্বারা শ্রীনারায়ণের চরণসেবা করিতেছেন, ইনি চতুর্ভুজা, স্বর্ণপ্রতিমা সদৃশী এবং নবযৌবনা, ইনি নারায়ণের বামপার্শ্বে অবস্থিতা; ভূশক্তি জগতের সৃষ্টি-স্থিতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; লীলাশক্তি শ্রীনারায়ণের

পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহ

লীলাবিধায়িনী; ভূশক্তি ও লীলাশক্তি মূর্ত্তবিগ্রহরূপে লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাসীনা।] নারায়ণস্বরূপ প্রকাশের দুইটী উদ্দেশ্য—মুখ্য উদ্দেশ্য—তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার রস আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তিদান করিয়া জীবকে উদ্ধার—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব।"

পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের চতুষ্পার্শ্বে আদিচতুর্ব্ব্যূহের (দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহের) দ্বিতীয় বিকাশ পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশিত হইলেন। এখানেও ব্যূহসকল বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহের ১ম ব্যূহ বাসুদেব—পরব্যোমনাথ নারায়ণের বিলাস এবং সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। ইঁহার জ্ঞানশক্তি প্রধান। ২য় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ—ইনি বাসুদেবের বিলাস এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ, সেজন্য ইঁহাকে 'জীব'ও বলা হয়। ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। এখানে ইহাকে 'মহাসঙ্কর্ষণ' বলা হয়।

এখানে দ্বিতীয় ব্যূহ 'মহাসঙ্কর্ষণ' রূপে শ্রীবলরাম

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং মহাসঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি মিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হয়। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ।।
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়।।
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০। ২৫৫-২৫৭)

ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগে মহাসঙ্কর্ষণ প্রাকৃতসৃষ্টি অর্থাৎ অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

অপ্রাকৃত সৃষ্টি কিরূপে করিলেন তাহা বলিতেছেন— গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশমাত্র অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষ সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ঐসকল অপ্রাকৃত ধাম সৃষ্টি করিলেন। 'সৃষ্টি করিলেন' বলিতে সাধারণতঃ বুঝা যায় যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ঐসকল অপ্রাকৃত ধাম সৃজ্য (সৃষ্টি করিবার যোগ্য) বস্তু নহে—উহারা অনাদি ও নিত্য। মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়ের অন্তে উহাদের পুনরায় সৃষ্টি হয় কিন্তু অপ্রাকৃতধাম কোনসময়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—অনাদিকাল হইতে তাহার বর্ত্তমান আছে। "সৃষ্টি করিলেন" অর্থে বুঝিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সঙ্কর্ষণ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিদ্বারা ঐসকল ধাম প্রকাশ করেন। অপ্রাকৃতধাম সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও উহাদের ব্যাপ্তি আছে কিন্তু মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহার অপ্রকট বা অপ্রকাশ্য অবস্থায় থাকে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোনস্থানে শ্রীকৃষ্ণ যদি লীলা করিতে ইচ্ছা করেন। তখন সঙ্কর্ষণ ঐ সকলস্থানে লীলোপযোগী ধাম প্রকট বা প্রকাশ করেন।

পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের এক স্বরূপ—"তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ।" ইহাকে মহাসঙ্কর্ষণও বলা হয় [শেষাদিকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ শেষাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—সেজন্য তাঁহাকে 'মহাসঙ্কর্ষণ' বলা হয়।]

শ্রীবলরামের এক স্বরূপ এই মহাসঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের আশ্রয়—"মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়। যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।।" (চৈঃ চঃ) লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণানুসারেও এই সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ—অর্থাৎ ইহা হইতে সমস্ত

'মহাসঙ্কর্ষণ' শ্রীবলরাম সমস্ত জীবের আশ্রয়

জীব উদ্ভুত হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইঁহার (অন্যতমস্বরূপ কারণাব্ধিশায়ীর) মধ্যে আনয়ন করেন এজন্য ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়*। তিনি জীবের আশ্রয়—সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে নিত্যদেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়ীরূপে সকলকে স্বীয় দেহে আকর্ষণ করেন। সুতরাং শ্রীসঙ্কর্ষণই মূলতঃ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ—সৃষ্টি আদি কার্য্যের মূল অধ্যক্ষ— কারণের কারণ।

মহাসঙ্কর্ষণই কারণাব্ধিশায়ী পুরুষের কারণ—"সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়।" পরব্যোমের বাহিরে যে 'সিদ্ধলোক'—তাহারও বাহিরে যে 'কারণার্ণব'— সেখানে শ্রীসঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশরূপে শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহার এই স্বরূপকে "কারণার্ণব-শায়ী পুরুষ' বলা হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ (অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়া-শক্তি শ্রীসঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা কিছু কম), তিনিই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তিসঞ্চার করেন—তাহাতে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং সর্ব্বশেষে জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহে পরিণত হইল এই কারণার্ণব-শায়ী পুরুষকে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুও বলা হয়। মহাবিষ্ণুর অংশ 'গর্ভোদশায়ী পুরুষ' ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং তাঁহার অংশ 'ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ' প্রত্যেক

তিনি কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষের কারণ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের ১০। ২। ১৩ শ্লোকের ভাষ্যে বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীল সনাতন গোস্বামী সঙ্কর্ষণ নামের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রলয়াদৌ জগদাকর্ষণাদিত্যর্থঃ"। প্রকটলীলায়ও সঙ্কর্ষণ নামের সার্থকতা এই যে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া দেবকী গর্ভ হইতে শ্রীবলরামকে আকর্ষণ করিয়া নন্দালয়ে তাঁহার নিত্যজননী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন।

জীবের অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের মূল কর্ত্তা বা নিয়ামক সঙ্কর্ষণ।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অবতার। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন, "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রবিশৎ"—শ্রুতি। সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় স্বরূপ হইলেন 'গর্ভোদশায়ী পুরুষ'। গর্ভোদশায়ীর নাভি-পদ্ম হইতে ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং ঐ নাভিপদ্মের নাল হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি। আমাদের এই ভূলোক বা পৃথিবী এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্যতম। এই ভুবনে সাতটী সমুদ্র আছে উহার একটীর নাম ক্ষীরাব্ধি। এই ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটী দ্বীপ আছে, সেই শ্বেতদ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম। গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ তৃতীয় পুরুষ 'ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু'। ইনি ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা—প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনিই এক এক রূপে অন্তর্য্যামিরূপে বিরা-জিত। ইনিই জগতের পালনকর্ত্তা, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, অধর্ম্মের দূরীকরণ এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ইঁহারই কার্য্য। এজন্য ইনি যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারের অংশী।

গর্ভোদশায়ী
দ্বিতীয় পুরুষ

তৃতীয় পুরুষাবতার
ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু

অনন্তদেব বা শেষও শ্রীবলরামের অংশ—অনন্তদেবকে ক্ষীরোদ-শায়ীর অংশ বলা হয়। সেজন্য তাঁহাকে শ্রীভগবানের এক কলা বলা হয় "আস্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি—ভাঃ ৫। ২৫। ১—ভগবানের এক কলা (অংশ) আছে, তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার নাম অনন্ত।" তিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তক এতই বিস্তীর্ণ এবং তাঁহার শক্তিও এত অধিক যে, এত বড়

অনন্ত বা শেষ

পৃথিবীটা (মহী) মাথায় কোন্‌স্থানে পড়িয়া আছে তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার সহস্র ফণা; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত। ফণায় যে সমস্ত মণি আছে তাহাদের জ্যোতিঃ এত উজ্জ্বল যে, সূর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করেন। পৃথিবী দৈর্ঘ্যবিস্তারে ৫০ কোটি যোজন। এত বড় পৃথিবীটা তাঁহার ফণায় যেন একটি সর্ষপের মত অবস্থান করিতেছেন।

অনন্তদেব ভক্ত অবতার—ভগবানের সেবাই তাঁহার কার্য্য। অনন্তদেবের একটী নাম শেষ (অংশ)—অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের অংশ — 'শিষ্যতে ইতি শেষোহংশ'। শ্রীভগবানের শয্যারূপে তিনি সর্পাকৃতি *।

অনন্তদেব যে শুধু পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহা নহে। তিনি সহস্রবদনে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছেন তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। তাঁহার মুখে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন। তিনি যে শুধু মুখে ভগবৎকথা কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহা নহে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদি সেবার উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন।

ঐ সকল ভগবৎস্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাসের মূর্ত্তি ও তাঁহার

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (৫। ২৫। ৪-৫) জানা যায় তাহাতে তিনি সর্পাকার নহেন তাঁহার দুই চরণ, এক মস্তক এবং বলয়শোভিত অনেক ভুজ আছে, সেই সমস্ত ভুজে নাগকন্যাগণ অনুরাগবশতঃ অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন; তাঁহার দেহ রজতধবল। ভাঃ ২। ৭। ৪১ শ্লোকে তিনি যে সহস্রবদন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সহিত অভিন্ন। এই সকল স্বরূপগণের নাম যে শুধু স্মৃতিশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে তাহা নহে, শ্রুতিতেও উহার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

ওঁ কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় ওঁ তৎসৎ
ভূর্ভুবঃ স্ব তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।
ওঁ কৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎ সৎ
ভূর্ভুবঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।। (গোপালতাপনী)

বৈকুণ্ঠস্থ ঐ সকল ভগবৎস্বরূপগণ কৃষ্ণের লীলাময় প্রকাশরূপ। কিন্তু এই সকল প্রকাশরূপে কৃষ্ণ আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন নাই, আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য ইঁহাদিগকে কৃষ্ণের স্বাংশস্বরূপ বলা হয়। তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। লীলার প্রয়োজনানুসারে কাহারও মধ্যে কোন শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ নহেন—তিনি পূর্ণতত্ত্ব।

অবতার—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কিংবা তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎস্বরূপ-গণের মধ্যে কেহ যখন প্রাকৃত বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন তথা তাঁহাকে বা তাঁহার সেই ভগবৎস্বরূপকে অবতার বলা হয়। কোন বিশেষ কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য জগতের কোন সুযোগ্য মহাপুরুষে কৃষ্ণ কর্ম্মসাধনোপ-যোগী স্বীয় শক্তির আবেশ করেন। এইরূপ

অবতার

অবতারকে কৃষ্ণের 'আবেশাবতার' বলা হয়। কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ অবতার ভিন্ন অন্য সকল কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ— "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ)—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অন্য সকল কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ —"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ)—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অন্য সকল অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ বা কলা। এজন্য কৃষ্ণ সকল অবতারগণের আদি বা মূল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্তস্বরূপের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তিনরূপে বিলাস করেন।

(১) **স্বয়ংরূপ**—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যত"—যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না তাঁহাকে 'স্বয়ংরূপ' বলা হয়। অন্য যেসকল ভগবৎস্বরূপ আছেন সকলের মূল শ্রীকৃষ্ণ; অন্যান্য ভগবৎস্বরূপগণের অস্তিত্ব, কিংবা তাঁহাদের ভগবত্তার অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপর ও তাঁহার ভগবত্তার উপর নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না— সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ, তাই শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বয়ংসিদ্ধরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয় ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা।।" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন," "ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্" (ব্রহ্ম সংহিতা)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। তাঁহার স্বয়ংরূপের আকার কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যকিশোর, নবজলধর শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী, বনমালাশোভিত। লঘু ভাগবতামৃতের মতে স্বয়ংরূপে যখন লীলার প্রয়োজনে তদনুরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন তখন ঐ বহুমূর্ত্তিকে স্বয়ং রূপের 'প্রকাশ' বলা হয়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী এই প্রকাশ স্বীকার করিয়া প্রকাশের দুইটি বিভাগ করিয়াছেন—রাসলীলায় ও মহিষী বিবাহে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি তাঁহার **প্রাভব প্রকাশ** এবং শ্রীবলরামে তাঁহার **বৈভব প্রকাশ**।"বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রী-বলরাম। বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান।।"

শ্রীবলরাম কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ

—একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙ্গসন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলা হয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন—"প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ। বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাঃ"—প্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভব তদপেক্ষা বেশী শক্তি।

(২) **তদেকাত্মরূপ**—লঘুভাগবতামৃত বলিতেছেন—“যদ্রূপং তদ-ভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।।” —স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গ সন্নিবেশ), ভাববেশাদির কিছু পার্থক্যবশতঃ সেরূপকে স্বয়ংরূপ হইতে অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় (বস্তুতঃ অন্যরূপ নহে) তাহাকে ‘তদেকাত্মরূপ’ বলা হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন “সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে ‘তদেকাত্ম’ নাম তাঁর।।”— চৈঃ চঃ মধ্য ২০। ১৮৩

তদেকাত্মরূপের আবার দুইটী ভেদ আছে—বিলাস ও স্বাংশ। ঐ দুইভেদ শক্তির তারতম্যানুযায়ী। **বিলাস**—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কোন লীলা-বিশেষের জন্য যদি অন্য আকারে প্রতিভাত হন এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি প্রায় স্বয়ংরূপের তুল্য হয় তবে এই অন্য আকারকে ‘বিলাস’ বলা হয়— যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ। **স্বাংশ**—‘বিলাসের’ ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়াও ‘বিলাস’ অপেক্ষা অল্পশক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে ‘স্বাংশ’ বলা হয়— যেমন স্বস্বধামে সঙ্কর্ষণাদি, পুরুষাবতার এবং মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ।

(৩) **আবেশ**—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোন বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জগতের কোন সুযোগ্য মহাপুরুষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-সাধনোপযোগী স্বীয় শক্তির আবেশ করেন, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলা হয়। যেমন নারদ, সনকাদি মুনিগণ।

এখন দেখা যাউক শ্রীবলরামের সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সম্বন্ধ। **শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ**—“তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম”—অর্থাৎ তত্ত্বতঃ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একই। শুধু লীলার

প্রয়োজনের নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশ। পূর্ব্বে তদেকাত্মরূপের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই কিন্তু আকার ও ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য বশতঃ অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলা হয়। এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি স্বয়ংরূপের তুল্য হয় তবে তাঁহাকে বিলাস বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম স্বরূপে অভিন্ন হইয়া ও লীলাবিশেষের উদ্দেশ্যে শ্রীবলরামের বর্ণ ও বেশাদি ভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, পীতবসন এবং শ্রীবলরাম রজতশুভ্রবর্ণ ও নীলবসন—এই অর্থে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংরূপের বিবিধ প্রকাশ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'স্বয়ংরূপ' একই বপুতে যখন বহুমূর্ত্তি হইয়া নিজেকে প্রকটিত করেন তখন তাঁহার 'প্রাভব প্রকাশ' (যেমন রাসলীলায় ও মহিষী বিবাহে) এবং যখন তাঁহার বর্ণ মাত্র ভেদে প্রকাশ তখন তাঁহার 'বৈভব-প্রকাশ'। 'বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের —শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্রভেদ সব কৃষ্ণের সমান।।' ব্রজে গোপস্বরূপে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ এবং দ্বারকা ও মথুরায় ক্ষত্রিয়স্বরূপে তিনি 'প্রাভববিলাস'। 'বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে। একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে।।'

শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের 'প্রাভববিলাস'

বেশ সম্বন্ধে শ্রীবলরামের ব্রজে ও দ্বারকায় কিছু পার্থক্য আছে—উভয়ধামেই তাঁহার একই দেহ ও বর্ণ কিন্তু ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে। 'ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন। বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম।।' বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন তখন তাঁহার গোপভাব ও গোপবেশ এবং যখন তিনি মথুরা দ্বারকায় থাকেন তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশ।

শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ—'আদ্যকায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়।'' যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একদেহ হইতে এক বা ততোঽধিক দেহ প্রকটিত হয় তখন প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়ব্যূহ বলা হয়। লীলার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেসকলরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছেন শ্রীবলরাম তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ, সেজন্য তাঁহাকে আদ্যকায়ব্যূহ বলা হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়—সহায়তার জন্যই শ্রীবলরাম প্রকটিত। তিনি কিভাবে লীলার সহায়তা করিতেছেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাও বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণ, কারণাতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচরূপে আত্ম-প্রকটন করিয়াছেন। এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ—বলরামের অংশ, কারণাব্ধিশায়ী-আদি তাঁহার কলা (অংশের অংশ)।

শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের 'আদি কায়ব্যূহ'

শ্রীবলরামের 'কৃষ্ণলীলার সহায়'রূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা

শ্রীবলরাম হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ — সঙ্কর্ষণ ইঁহারই অংশ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে (মূলসঙ্কর্ষণরূপে) এবং তদ্ভিন্ন সঙ্কর্ষণাদি পাঁচরূপে (মোট ছয়রূপে) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মূলসঙ্কর্ষণরূপে শ্রীবলরাম ব্রজে ও দ্বারকায় সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়তা করেন। সৃষ্টি লীলাকার্য্যে চারিস্বরূপে শ্রীবলদেব লীলার সহায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণরূপে গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামসমূহের প্রকাশ করেন। শ্রীবলরামস্বরূপ সঙ্কর্ষণ মধ্যে ক্রিয়াশক্তি প্রধান সেজন্য এইসকল কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। কারণার্ণবশায়ী আদি তিনরূপে শ্রীবলদেব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিলীলার সহায়তা দ্বারা কিরূপে শ্রীভগবানের সেবা হয়? শ্রীভগবান স্বয়ং স্বহস্তে সৃষ্টিকার্য্য করেন না। লীলার সৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়। সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার সেই ইচ্ছা পূরণ করিয়া তাঁহার সুখ সম্পাদন করেন।

সুতরাং তাঁহার সুখ সম্পাদন—আজ্ঞাপালনরূপ কার্য্যের দ্বারা সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

'শেষ বা অনন্তরূপে' শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কিভাবে সেবা করিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব আবার স্বয়ংরূপে গুরু, সখা, ভৃত্য, এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করেন—কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা। পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা।। বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসম্বাহন।। আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনাকে মানে। (চৈঃ চঃ আদি ৫। ১৩৫-৩৭)

শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের গুরু, সখা ও ভৃত্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করেন

উক্ত পয়ারে সখ্যভাবের প্রকাশ—ব্রজলীলায় কৃষ্ণ ও বলরাম কম্বলাদিদ্বারা নিজ নিজ দেহ আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতে, বৃষের ন্যায় শব্দ করিয়া মাথা নোঙাইয়া মাথায় মাথায় ঠেকোঠুকি করিতেন।

গুরুভাবের প্রকাশ—কখনও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পাদসম্বাহন করিতেন।

ভৃত্যভাবের প্রকাশ—কখনও শ্রীবলদেব নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পাদ সেবা করিতেন। নিজেকে কৃষ্ণের 'কলার কলা' অর্থাৎ অংশের অংশ মনে করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐসকল ভাবব্যঞ্জক বহু শ্লোক রহিয়াছে।

শ্রীরামাবতারে বলদেবই অংশে লক্ষ্মণ—

রামাবতারে শ্রীবলরামই লক্ষ্মণ

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।
(ব্রহ্মসংহিতা)

উপরিউক্ত ব্রহ্মার উক্তিতে বলা হইল হে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ('কলানিয়মেন'—কলা—শক্তি, নিয়ম—নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ শক্তি বিকাশের তারতম্য বিধান করিয়া অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, কিন্তু অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপগণের মধ্যে উহার আংশিক বিকাশ। এজন্য রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবৎস্বরূপগণ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ। এজন্য রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং লক্ষ্মণ শ্রীবলরামের অংশ। রামাবতারে শ্রীবলরাম লক্ষ্মণরূপে রামের কনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার মনে রামচন্দ্রের প্রতি ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরববুদ্ধি ছিল—মর্য্যাদা লঙ্ঘন অপরাধের ভয়ে তিনি দুঃখজনক কার্য্যে রামচন্দ্রকে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেও জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে দুঃখজনক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে কিংবা সুখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য উপদেশাদি দিতে পারিতেন না। শ্রীরামের দুঃখদর্শনে লক্ষ্মণ মর্ম্মাহত হইতেন কিন্তু স্বাতন্ত্র্য না থাকায় নীরবেই সহ্য করিতে হইত।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্যেষ্ঠ-অভিমান বশতঃ নিজের ইচ্ছামত সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন।

শ্রীবলরামে ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, লীলা-শক্তির সাহায্যে কেবল অন্তরঙ্গ লীলারস আস্বাদনেই নিমগ্ন। ক্রিয়াশক্তি-মূলক অন্যান্য লীলাকার্য্য শ্রীবলরামস্বরূপেই তিনি নির্ব্বাহ করেন।

শ্রীবলরাম মূল ভক্তিতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সেবকত্বের আবির্ভাবই শ্রীবলরাম। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে"। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির পরিণাম-বিশেষই ভক্তি—যাহা সেবার প্রাণ। সুতরাং ভক্তি বা সেবার মূলই হইল চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং সেব্যতত্ত্ব ও সেবকতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীবলরামের চরণাশ্রয় ব্যতীত উহা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ হলধর (বলরাম), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ বলদেব, তিনিই নিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ (অংশ) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের দুই অঙ্গ (অংশ)—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। গৌর-অবতারে শ্রীনিত্যানন্দরূপ শ্রীবলরামকে 'পাষণ্ড দলনবানা' বলা হইয়াছে। যাহারা পাষণ্ড— অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ আচারবান্, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কীর্ত্তনাদির অলৌকিক প্রভাব দ্বারা তাহাদিগের পাষণ্ডত্ব দূরীভূত করিয়াছিলেন—তাহারা তাহাদের বেদবিরুদ্ধ আচার, নাস্তিক্যবাদ কিংবা অন্য কুমত পরিত্যাগ করিয়াছিল। সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ এবং অনন্তদেব (শেষ)—ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশ বা কলা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রেতাবতারের লক্ষ্মণ শ্রীনিত্যানন্দের অংশ। শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং-কৃষ্ণ গৌরভগবানের অঙ্গ—তাঁহার ভক্তস্বরূপ, শ্রীচৈতন্যের দাস-অভিমান—'কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা,' তাঁহার বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্যভাব—এই সমস্ত বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

গৌরলীলায়
শ্রীবলরামই
নিত্যানন্দ

—o—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করা হইবে—

১। মহাপ্রভুর স্বরূপ কি? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি এক অভিন্ন পরতত্ত্ব? তাঁহার ভগবত্তা—এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ।

২। মহাপ্রভুর অবতারের কারণ।

৩। মহাপ্রভু কি কলির যুগাবতার?

৪। পীতবর্ণ কি প্রতি কলিযুগাবতারের বর্ণ? ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর স্বরূপ, অবতারের কারণ ও স্বয়ং ভগবানের লীলা

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন, সেই একই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণই গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন, স্বয়ং ভগবানের লীলাপ্রবাহের পূর্ব্বার্দ্ধ ব্রজলীলা এবং অপরার্দ্ধ নবদ্বীপলীলা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য অবতারগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামও বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (ভাঃ ১।৩।২৫)। অন্যান্য অবতার সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এক-পর্য্যায়-ভুক্ত নহেন— সেই সন্দেহ দূরীকরণের জন্য সূত গোস্বামী অপর একটি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮) অর্থাৎ অন্যান্য অবতার সকল পুরুষের অংশ বা বিভূতি মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনিই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং ভগবান্। অন্য কোন অবতার বা স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনিই পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে "রসো বৈ সঃ"—'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'লীলা' বলিতে কি বুঝা যায়? আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন পরিকর ভক্তদিগের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহার পরিকর ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করেন—ইহার জন্যই তাঁহার লীলা প্রকটন। আনন্দস্বরূপ ভগবানের আনন্দের উচ্ছ্বাসেই পরিকরভক্তগণের সহিত যে আনন্দময়ী ক্রীড়া—তাহার নামই লীলা। তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি তাঁহাতে এই লীলার প্রেরণা যোগাইয়া থাকেন। এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট উভয়বিধ অবস্থায়ই চলিতেছে। অপ্রকট গোলোকে তাঁহার নিত্যপরিকরদিগের সহিত লীলা করিতেছেন। আবার তাঁহার সর্ব্বভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ—তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণকে, সাধক ভক্তগণকে এবং ভজনোন্মুখ ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য প্রকট-ভাবে মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন—"এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ' (চৈঃ চঃ)। প্রকট লীলার আরও উদ্দেশ্য এই যে অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদি ও পরব্যোমে যে সমস্ত লীলার প্রচলন নাই ব্রহ্মাণ্ডে উহা আরও বৈচিত্রীর সহিত প্রকট করিতে পারেন। "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার।।" (চৈঃ চঃ) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব্ব আনন্দ চমৎকারিতা আস্বাদন করিবার জন্য প্রকট লীলায় জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাত্মক লীলা প্রকটন করিয়াছেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তকে আনন্দ দান। কারণ ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের প্রীতি ব্যতীত আর কিছু চাহেন না, শ্রীভগবানও ভক্তের সুখ ব্যতীত আর কিছু জানেন না। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি, নাহং তেভ্যো মনাগপি' (ভাঃ ৯।৪।১৮)। লীলা প্রকটনের আরও উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলাদির কথা শ্রবণ করিয়া যাহাতে

মায়ামুগ্ধ মনুষ্যদেহধারী জীবও তাঁহার চরণ সেবায় আকৃষ্ট হইয়া 'তৎপরায়ণ' হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে তিনি লীলা করিয়া থাকেন—"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"—ভাঃ ১০।৩৩।৩৬ *। প্রকটলীলার দ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করাও তাঁহার উদ্দেশ্য।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।।"

— চৈঃ চঃ আ ৪। ৩৩

---

* এই শ্লোকটির অনেক সময় বিকৃতার্থ হইয়া থাকে। সেজন্য উহার একটু আলোচনা আবশ্যক। রাসলীলা শ্রবণের পর মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ আপ্তকাম হইয়াও কেন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন? তদুত্তরে এই শ্লোক বলা হইয়াছে। মনুষ্যদেহধারী জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই লীলা—উদ্দেশ্য যাহাতে তাহারা 'তৎপরায়ণ' হইতে পারে। মনুষ্যদেহধারী জীব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যেরই ভগবৎলীলা অনুসরণ রূপ ভজনে অধিকার ও তাহাতে আনন্দ-লাভের যোগ্যতা আছে। 'তৎপর' বলিতে ভগবৎপরায়ণ বা লীলাপরায়ণ বুঝা যায়—ভগবান্ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার—অর্থাৎ ভগবানে অনন্যনিষ্ঠ; অথবা ভগবৎলীলাই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার—অর্থাৎ একমাত্র ভগবল্লীলাকেই যিনি শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া লীলাপরায়ণ। শেযোক্ত অর্থে সাবধান হইতে হইবে যে 'লীলা অনুষ্ঠানে রত' বা 'লীলা অনুকরণ রত' নহে। কারণ শ্রীভগবান্ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ শক্তির প্রেরণায়—স্বরূপ শক্তির সহিত। প্রাকৃত জীবের মধ্যে স্বরূপ শক্তির সম্ভাবনা নাই সেজন্য ভগবল্লীলানুকরণ মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ। রাসলীলা যাহাতে কেহ অনুকরণ না করেন সেজন্য শ্রীশুকদেব সাবধান-বাণী দিতেছেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।"—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

প্রকট ব্রজলীলায় দাস-সখা-মাতা-পিতা-কান্তা আদি পরিকরগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, কৃষ্ণ সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের (নির্ম্মল রাগ) কথা—উহার মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি ও প্রেমসেবার অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া জাগতিক সুখের, এমনকি স্বর্গাদি-সুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ যাহাতে ব্রজপরিকরদিগের আনুগত্যে রাগানুগ ভজনে প্রলুব্ধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কৃষ্ণলীলা করেন।

লীলাই যে তাঁহার অবতরণের মুখ্য কারণ এজন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতেও বলিয়াছেন,—"ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে' (ভাঃ ১০।২।৩৯) হে ঈশ, অসংসারী আপনার জন্মকারণ বিনোদ (ক্রীড়া

—অনীশ্বর (দেহাদি পরতন্ত্র কিংবা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ) মনেও (বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা দূরের কথা) কখনও এই রাসাদি লীলার সমাচরণ (একটুও আচরণ) করিবে না। রুদ্র ভিন্ন অপর কেহ অজ্ঞতাবশতঃ সমুদ্রোত্থিত বিষ পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ কোনও জীব মূঢ়তাবশতঃ ঈশ্বরের লীলার অনুকরণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—শৃঙ্গার রস ত' দূরের কথা—শ্রীকৃষ্ণের অন্য রসের ভাবও অনুকরণ করা উচিত নহে। কৃষ্ণবৎ আচরণ না করিয়া ভক্তবৎ আচরণ করা ভাল—ভক্তের আচরণ করিতেও সাবধান হইতে হইবে, কারণ সিদ্ধভক্ত লীলাবিষ্ট অবস্থায় অনেক আচরণ করেন যাহা সাধকের পক্ষে অনুকরণীয় নহে—আবার সাধক ভক্তের আচরণও সবসময় অনুকরণীয় নহে কারণ 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাননন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।। গীঃ ৯।৩০—সাধক ভক্তদিগের মধ্যেও সুদুরাচার থাকিতে পারে সুতরাং তাঁহাদের আচরণও অনুকরণীয় নহে। এজন্য আচার্য্য-গণের সিদ্ধান্ত এই, যে সকল ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ পালন করিয়া আচরণ করেন তাঁহাদের আচরণই অনুকরণীয়।

বা লীলা) মাত্র, ইহা ব্যতীত আমরা আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আনন্দময় শ্রীভগবান্ আনন্দের উচ্ছ্বাসেই লীলার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মমোহন লীলার স্তবেও বলিয়াছেন—

"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।।"

—ভাঃ ১০।১৪।৩৭

হে প্রভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলে শরণাগত ভক্তসমূহের আনন্দরাশি বর্দ্ধন করিবার জন্য (প্রথিতুং) প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন (বিড়ম্বয়সি)। সুতরাং তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য এই যে শরণাগত ভক্তগণ যাহাতে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করাইবার সুযোগ পান এবং তিনিও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস ও মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইতে পারেন। ইহা দ্বারা যে লীলা প্রকটনের অন্যতম উদ্দেশ্য রাগমার্গের ভক্তি প্রচার, তাহাই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তি প্রচার প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"যে লাগি অবতার কহি সে মূলকারণ—
প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।"

— চৈঃ চঃ আ ৪১৪-১৫

পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।" 'ভূভারহরণ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাঁহার লীলা বা অবতরণের দুইটী কারণ—

(১) **প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন।** 'প্রেম' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তগণের স্বসুখ বাসনা-শূন্যা, ঐশ্বর্য্যাদিজ্ঞান-শূন্যা, একমাত্র কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্যবাসনা যাহাতে নাই, এমন নির্ম্মল প্রীতি বা সেবার বাসনা। নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের বাসনা থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি—মদীয়তাময়ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই এইরূপ ভাব থাকিবে, নতুবা কিসে তাঁহার প্রীতি ইহার অনুভূতি থাকা অসম্ভব। "আমার নিজজন" এই বুদ্ধি যাঁহার প্রতি না থাকে, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য সাধারণতঃ আমরা নিজের সুখ বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি না। আবার এই মমত্ববুদ্ধি সর্ব্বাতিশায়িণীভাবে প্রকাশিত হইতে পারে যখন প্রিয়ের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকে। যেখানে প্রিয়জনকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার ইচ্ছা, সেখানে কোনরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির ভাব থাকিলে 'প্রাণঢালা' ভাবে তাহাকে সুখী করা যায় না, সেখানে প্রীতিবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার অনন্ত মহিমা, অদম্য শক্তি—'আমি ক্ষুদ্র জীব, ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত', ইত্যাদি ভাব মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে স্বচ্ছন্দ ভাবে—প্রাণ মন ঢালিয়া—তাঁহার সেবার বাসনা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিতে পারে না—উহার চেষ্টাতেই নিজের ধৃষ্টতা জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে। সেজন্য যাঁহারা শুদ্ধ প্রেমের (কেবলা রতি) অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে স্বসুখবাসনা ত' নাইই, শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও নাই। তাঁহারা একমাত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সুখ সম্পাদনে প্রয়াসী। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম আস্বাদনের জন্য লালায়িত—"ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত"— চৈঃ চঃ— যে প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহাতে তিনি প্রীত হন না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলারতির যিনি আশ্রয়, তিনিও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে

ঐশ্বর্য্যকে স্বীকার করেন না। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে হয় সঙ্কুচিত রতি। দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি।।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবই এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্যকে স্বীকার করিতে দেয় না। যে সকল ভক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত প্রেমের অধিকারী, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি হইলে প্রেমানুরূপ (মাধুর্য্য বা বাৎসল্য) সম্বন্ধ-বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত বাৎসল্য প্রেমবান্ ভক্ত বসুদেব ও দেবকী কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটনের সময় তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য বিশুদ্ধ বাৎসল্যবতী মা যশোদার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য কোনদিনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন ও মা যশোদার ভাবের পার্থক্য দেখুন। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভূতি বর্ণনা করিলে অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলেন—

'এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।' গী ১১। ৩

মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, অর্জ্জুন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সখ্যভাব ভুলিয়া গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম ও স্তব করিলেন। অন্যপক্ষে মা যশোদার অবস্থা দেখুন। তাঁহার ক্রোড়গত বালগোপালের মুখবিবর মধ্যে তিনি যে বিশ্বরূপ দেখিলেন, তাহা অধিকতর বিস্ময়াবহ ও অচিন্ত্যশক্তি- বৈভবসম্পন্ন। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পার্থসারথিরূপ অন্তর্হিত করিয়া সহস্রবদন, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্রচরণযুক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন—শ্রীভগবানের কৃপাদত্ত দিব্যদৃষ্টিতে অর্জ্জুন উহা দেখিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মা যশোদা যখন বিশ্বরূপ দেখিলেন, তখন তাঁহার ক্রোড়স্থ বালগোপালমূর্ত্তি অন্তর্হিত হন নাই কিংবা সেই শিশুমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হন নাই— ক্রোড়গত বালকেরই ক্ষুদ্র মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিলেন। মা যশোদা

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা জানান নাই কিংবা উহা দেখিবার জন্য তাঁহার দিব্যদৃষ্টিলাভের প্রয়োজন হয় নাই। অযাচিতভাবে ঐরূপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু তাহাও তিনি গ্রহণ করিলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রার্থিত দেবতাগণের চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরূপকে উপেক্ষা করিলেন। ঐ বিশ্বরূপ দর্শনেও মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেম বা বালগোপালের সহিত প্রেমানুরূপ সম্বন্ধ লুপ্ত হয় নাই। বরং তিনি গোপালের অমঙ্গলাশঙ্কায় অধীরা হইয়া উঠিলেন এবং অসুর রাক্ষসাদির আবেশ হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীনারায়ণকে ডাকিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন স্তবস্তুতি করিয়া পরিশেষে সেই বিরাট্‌রূপ সম্বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীভগবান্ আবার তাঁহার পার্থসারথিরূপ প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবাপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।"

শ্রীভগবানের লীলাশক্তিই এই অচিন্ত্য পরমাদ্ভুত বিশ্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, কিন্তু মা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের নিকট তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইল— সেজন্য বিশ্বরূপ প্রকাশিত হইয়াই অন্তর্হিত হইলেন— অর্জ্জুনের ন্যায় মা যশোদার স্তবস্তুতি দ্বারা এই রূপ সম্বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয় নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়া যান। এরূপ প্রেমাধিকারীর প্রেমাধীনতা ব্যতীত তাঁহার প্রেমরসের আস্বাদন হয় না। তাই তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "অহং ভক্তপরাধীনঃ"—আমি ভক্তের পরাধীন। তিনি যে ভক্তের বশীভূত শ্রুতিও উহা বলিয়াছেন— "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেনৈবং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।"—(মাঠর শ্রুতি)। এই প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ লীলানির্ব্বাহ ব্যপদেশে ব্রজে তাঁহার স্বরূপ ও স্বরূপশক্তিগণকে— তাঁহার দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণরূপে প্রকট করাইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ

ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণও এই লীলা পরিকরদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। দাস, সখা ইত্যাদি পরিকরদিগের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি আছে, তথাপি উহার তারতম্য রহিয়াছে— দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা মাতাপিতায় এবং মাতাপিতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি অধিক। এই তারতম্যানুসারে উহাদের প্রেমের মাধুর্য্যেরও তারতম্য। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসের আস্বাদনের জন্য লালায়িত। এই কারণে তিনি যখন মায়িক প্রপঞ্চে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন উক্ত চারি রকমের পরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া যান।

'রস' বলিতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় রতি (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর)। যখন উহা বিভাব—অনুভাবাদির সহিত মিলনে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তখন তাহাকে প্রেমরস বলা হয়। উহার সার বা পরিপুষ্ট অবস্থাকে প্রেমরস-নির্য্যাস বলা হয়।

অবতারের দ্বিতীয় কারণ রাগানুগা ভক্তির প্রচার। ব্রজলীলা নিগূঢ় রসপূর্ণ। অনর্থযুক্ত জড়রসপূর্ণ চিত্তে উহার অনুভব অসম্ভব। অনুভব বিনা উহার আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও অনধিকারচর্চ্চা। তথাপি রাগানুগাভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল কবিরাজগোস্বামি-পাদ ও অন্যান্য প্রেমিক ভক্তগণের আনুগত্যে তাঁহারা উহার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস মাত্র করা হইতেছে।

'রাগ' বলিতে কি বুঝায়? "ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ কথন।।" (চৈঃ চঃ) ইষ্টবস্তুর (শ্রীকৃষ্ণের) সুখসম্পাদনের জন্য স্বাভাবিকী যে প্রেমময়ী গাঢ়তৃষ্ণা অর্থাৎ ইহকালের বা পরকালের সর্ববিধ স্বসুখবাসনাদি রহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে মমতাময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদনের যে অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা বা লালসা উহাই রাগের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং ঐ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে

বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চিন্তাতে যখন ভক্তের চিত্ত আবিষ্ট থাকে তখন তাঁহার এই আবিষ্টতাবোধক লক্ষণগুলি তাঁহার বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয়ে দৃষ্ট হইলে ঐ লক্ষণগুলিকে রাগের তটস্থ লক্ষণ বলা হয়—তিনি চক্ষুতে যাহা কিছু দেখেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোন বস্তু বলিয়া মনে করেন, কর্ণে যাহা কিছু শুনেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়া মনে করেন, নাসিকায় যাহা কিছু সুগন্ধ অনুভব করেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর আঘ্রাণ বলিয়া মনে করেন, জিহ্বায় যাহা কিছু সুস্বাদু বলিয়া অনুভব হয় উহাই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ বলিয়া মনে করেন। অন্তরিন্দ্রিয় মনটী সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিন্তাতে নিমগ্ন থাকে। স্ব স্ব ইষ্টবস্তুতে এইরূপ যে অনুরাগময়ী ভক্তি তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

এই 'রাগ' শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর—নন্দ-যশোদাদি, শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখাদি, সুবল-মধুমঙ্গলাদির মধ্যেই সম্ভব। তাঁহারাই এই ভক্তির আশ্রয়। "রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে" (চৈঃ চঃ) এইরূপ ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন তখন তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। "রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।"

এই রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজপরিকরদিগের ভাবভেদে দুই প্রকার—(১) সম্বন্ধরূপা ও (২) কামরূপা। নন্দযশোদাদি পিতৃমাতৃ বর্গ, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ, রক্তক-পত্রকাদি দাসবর্গ মধ্যে তাঁহাদের একটী সম্বন্ধের অভিমান আছে—দাস্যভাবের পরিকরদিগের সেব্যসেবক সম্বন্ধ, সখ্যভাবের পরিকরদিগের সখা-সখা বা সমান-সমান সম্বন্ধ, বাৎসল্য-রসের পরিকরদিগের পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র সম্বন্ধ এবং মধুরভাবের পরিকরদিগের কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ। যেরূপ সেবায় তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে সেইরূপ যথাযোগ্যভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা

করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ভক্তিকে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। সম্বন্ধানুরূপ অভিমানই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক। আর যাঁহাদের মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধের অভিমান নাই— যে প্রকারেই হউক না কেন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই যাঁহাদের একমাত্র কামনা এবং এই কামনাই যাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তিকে কামরূপা বলা হয়। ব্রজবধূগণই ইহার পাত্র, কারণ তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধের অভিমান নাই—একমাত্র সেবাবাসনাই তাঁহাদের সেবার প্রবর্ত্তক—এইজন্য তাঁহারা বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না মানিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। [শেযোক্ত বাসনাকে প্রেমরূপা না বলিয়া কামরূপা বলা হইলেও যেন কেহ ভুল বুঝিয়া অপরাধ না করেন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনাকে 'কাম' বলা হয়। কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগেরও কৃষ্ণসুখবাসনা (প্রেম) ছাড়া আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনার গন্ধও ছিল না। ইহার কারণ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন "সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি 'কাম' নাম।।" শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সুখী করার জন্য তাঁহার সহিত গোপীদিগের যে লীলাদি দেখা যায় উহাতে কামক্রীড়ার বাহ্যসাদৃশ্য থাকা হেতু উহাকে কাম বলা হইয়াছে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"। আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, এজন্য তাঁহারা উহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উহা প্রীতি প্রকাশের একটী স্বাভাবিক উপায় মাত্র—প্রীতি প্রকাশের উচ্ছ্বাস।] রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে। জলপানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলা হয়। দেহে প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হইলে তৃষ্ণা— জলপানের ইচ্ছা, তৃষ্ণা গাঢ় হইলে জলপানের জন্য উৎকণ্ঠা তত বৃদ্ধি হইবে। সেইরূপ ইষ্টবস্তুর সেবাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য যে প্রবল লালসা তাহাই গাঢ় তৃষ্ণা। তবে তৃষ্ণা যেমন প্রাকৃত মনের বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ তৃষ্ণা মনের বৃত্তি নহে। প্রাকৃত মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জলপানে

উহার নিবৃত্তি হয় কিন্তু রাগাত্মিকা যে তৃষ্ণা তাহার শান্তি নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—"তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।" চিৎশক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা যাহা একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত হয়—উহার স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে উহা যত পান করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এই রাগাত্মিকা ভাবকে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা বলিয়াছেন। স্ব-রস সম্বন্ধীয়—যাহার যেই রস সেই রসোচিত আবিষ্টতা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ইহার যে রসে যিনি বিভাবিত সেই রস তিনি ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্য নিজের ভাবোচিত সেবাদ্বারা বলবতী উৎকণ্ঠায় আবিষ্ট— সেইজন্যই জীবগোস্বামিপাদ উহার অর্থ 'স্বাভাবিকী' করিয়াছেন, যাঁহারা এই রাগের অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে উহা সহজাত (কোনরূপ সাধনদ্বারা লভ্য নহে), উহা নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকরগণের নিত্যসিদ্ধ বস্তু।

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা একার্থ-বাচক নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজের নিত্য পরিকরদিগের নিজস্ব সম্পত্তি। উহা সাধকমধ্যে লক্ষিত হইবার বস্তু নহে। রাগাত্মিকার অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। "রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে" (ভঃ রঃ সি)। সাধকের পক্ষে রাগাত্মিক ভাবের আনুগত্য করাই শ্রেয়ঃ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, আর ব্রজপরিকরগণ তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিতে গেলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "সখী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে" (চৈঃ চঃ)। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য হেতু গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করায় রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার পান নাই। রাসলীলায় মাধুর্য্যে তাঁহার লোভ হইয়াছিল, তাহাতে প্রবেশের

জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবেশাধিকার পান নাই। রাগাত্মিকার যে সমস্ত সেবা তাহাতে সহায়তা ও আনুকূল্য করাই রাগানুগা সেবা।

এই রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক বৃত্তি কি? কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা গ্রন্থাদিতে কিংবা প্রেমিক ভক্তগণের মুখে বর্ণিত এই রাগাত্মিকা ভক্তিপ্রসূত কৃষ্ণসেবার মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া যদি কোন ভাগ্যবানের লোভ জন্মে তখন তিনি ঐ ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং এই লোভই হইল রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক। এই লোভপ্রাপ্তিও সৌভাগ্যসাপেক্ষ। এই লোভের হেতুও কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা—"কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকারুণ্যমাত্র-লাভৈক হেতুকা" (ভঃ রঃ সিঃ)। এই কৃপা যিনি লাভ করেন, তিনিই ভাগ্যবান্।

এই রাগানুগা-ভক্তির প্রকৃতি এই— সেবায় লোভোৎপত্তি সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের বা যুক্তির কোন অপেক্ষা মানে না—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি"। কোন্‌টা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহাই নির্ণয় করার জন্য শাস্ত্রের প্রমাণ বা যুক্তির দরকার হয়। কিন্তু রাগানুগভাবে কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিলে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিংবা নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এই সকল বিচার মনে আসে না। [এখানে বিধিভক্তির সহিত পার্থক্য। বৈধীভক্তিতে শাস্ত্রশাসনের ভয়ই ভক্তির প্রবর্ত্তক, কিন্তু রাগানুগা-ভক্তির প্রবর্ত্তক হইল লোভ। যিনি কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনেই কৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে।]

এখানে একটী কথা বিবেচ্য। কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপায় কৃষ্ণ সেবার লোভ জন্মে, তাহাতে অবশ্য শাস্ত্র-যুক্তির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শুধু লোভ জন্মিলেই হয় না। ঐ সেবা প্রাপ্তির জন্য নিজেকে উপযোগী করার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্রাদি অনুশীলন কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা যে-সকল ভক্ত উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তাঁহাদের উপদেশাদি হইতে হইবে, নতুবা সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। এজন্য যে-সকল শাস্ত্রবিধি আছে, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা নিজের মনঃকল্পিত উপায় অবলম্বন করিলে উহাতে ভজন হয় না। সেজন্য 'ভঃ রঃ সিঃ' বলিয়াছেন—"শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে"।।

এখন এই রাগানুগা-ভক্তির আশ্রয় কাঁহারা? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাগাত্মিকা-ভক্তির আশ্রয় অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ; তাঁহাদের আনুগত্যে অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, সেই সমস্ত সেবায় আনুকূল্য করিয়া যে রাগানুগাভক্তি হইবে, সেই ভক্তির আশ্রয় কাঁহারা? লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য, অনাদিকাল হইতেই উহা চলিতেছে। তাঁহার লীলাসিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকারের পরিকরগণও আবশ্যক। "অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান।।" তিনি বিভিন্ন স্বরূপে এবং বিভিন্ন শক্তির বিকাশরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তির সেবা যেমন নিত্যা, সেই সেবায় আনুকূল্যও (রাগানুগাভক্তি-সেবাও) নিত্য। এজন্য তাঁহার স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ ব্রজপরিকরগণ যেমন নিত্য, ঐরূপ রাগানুগা ভক্তিরও আশ্রয়রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর আছেন, যাঁহাদের মধ্যে এই রাগানুগা ভক্তি স্বাভাবিকভাবে বিরাজিত। এই রাগানুগা ভক্তির মধুর ভাবের নিত্য পরিকর শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি। মধুর ভাব ব্যতীতও অন্যান্য ভাবের পরিকর আছেন যাঁহারা রাগানুগার আশ্রয়রূপে নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন। এখন জীবের মধ্যে এইরূপ পরিকর আছেন কি না? ব্রজের নিত্য পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সেবায় তাঁহাদের স্বরূপগত অধিকার। সেজন্য তাঁহাদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী—অন্যনিরপেক্ষা। ভক্তিও হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী প্রধান স্বরূপ শক্তির বৃত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির কায়ব্যূহ পরিকরগণের সহিত ভক্তির সজাতীয়,

স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ সম্বন্ধ। কিন্তু জীবের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার অধিকার নাই, কারণ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—তাঁহার জীবশক্তির অংশ—তাঁহার বিভিন্নাংশ (অর্থাৎ বিশেষ ভেদযুক্ত অংশ)—তাঁহার স্বরূপ-শক্তি নহেন। "জীবশক্তি-বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোহংশ ন তু শুদ্ধস্য" (পরমাত্মসন্দর্ভ)। জীব শুদ্ধ স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহেন। এজন্য স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকাতে নিত্যমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ জীবের অধিকার থাকিতে পারে না। সেজন্য জীবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায়ই এবং সর্ব্বভাবে ভাবানুকূল দাসত্বই কর্ত্তব্য। যিনি সখ্যভাবে বিভাবিত, তাঁহার পক্ষে শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব। যিনি মধুরভাবে বিভাবিত, তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব ইত্যাদিই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। ইহাই রাগানুগার ধর্ম্ম।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের রাগানুগা সেবাও আনুগত্যময়ী, জীবেরও আনুগত্যময়ী সেবা। কিন্তু উভয়ের সেবা ঠিক একজাতীয় নহে। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সেবা স্বেচ্ছাধীন—ঐ সেবায় তাঁহাদের মুখ্য অধিকার, অনাদিকাল হইতে ঐ সেবায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু জীবের সেবা ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা পরিকরগণের কৃপাসাপেক্ষ, সুতরাং তাঁহাদের আনুগত্যেই রাগানুগা সেবাঅভিলাষী জীব সেবা কামনা করেন।

এই রাগানুগা ভক্তির সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—'বাহ্য' 'অভ্যন্তর' ইহার দুই ত' সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।'

বাহ্য সাধনে—সাধকদেহে শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধক দেহ বলিতে জীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'যথাবস্থিত দেহে' অর্থাৎ 'পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন পাঞ্চ-ভৌতিক দেহে'। যিনি এই রাগানুগা ভক্তির সাধক, তাঁহারও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির সাধন করিতে হইবে।

অন্তর সাধনে—'মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।'

যে সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট নিজ ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ-সেবোপযোগী একটী অপ্রাকৃত দেহ দ্বারা ব্রজপরিকরগণের অনুগত হইয়া নিরন্তর ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা চিন্তা করেন। তিনি এই অবস্থায় কাহার অনুগত হইয়া সেবা করিবেন, তাহা বলিতেছেন—"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।।" ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের রাগাত্মিকা-ভক্ত-পরিকর আছেন। দাস্যভাবের পরিকরদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ (সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়) রক্তক পত্রকাদি। সখ্যভাবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সুবল মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্যভাবের নন্দ যশোদাদি এবং মধুর ভাবের শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, ললিতা, বিশাখাদি। সাধক যেভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে লুব্ধ, সেইভাবের যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাঁহার অনুগত হইয়া (পাছে ত' লাগিয়া) অন্তর্মনা হইয়া বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় উহা নিয়োজিত করিবেন। রাগানুগমার্গে মধুরভাবের ভক্তের সিদ্ধদেহ গোপীদেহ, উহাতে শ্রীরাধিকার দাসী (মঞ্জরী) অভিমান। সাধক তাঁহার ভাবানুকূল মঞ্জরীর আনুগত্যে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এইরূপ সেবা শুধু মানসিকও হইতে পারে।

রাগানুগমার্গে সিদ্ধদেহে শ্রীহরির লীলাস্মরণের কথা পদ্মপুরাণেও বর্ণিত আছে। শ্রীসদাশিব নারদের নিকট বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা লাভের জন্য সাধক শ্রীরাধিকার কোন একজন সেবাপরায়ণা কিঙ্করীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবেন, প্রীতির সহিত প্রত্যহ মানসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনে যত্নপর হইবেন এবং এইরূপ ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।'

সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গের পর ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে

সিদ্ধদেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়া তাঁহাকে সেবায় প্রবিষ্ট করান। এই সিদ্ধদেহ কোন কল্পনার বস্তু নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবতি-হৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।—ভাঃ ৩। ৯। ১১

ব্রহ্মা বলিতেছেন—'হে নাথ, বেদাদি শাস্ত্রশ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। হে উরুগায়, সেই ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সেই সেই শরীর তুমি তাহাদের নিকট প্রকটিত কর।

এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ একটী বিকল্প তাৎপর্য্য বলিয়াছেন—সাধকভক্তগণ স্ব স্ব ভাবানুসারে নিজেদের যে যেরূপ মনে মনে ভাবনা করেন ভক্তপরবশ ভগবান তাঁহাদিগকে সেইরূপ সিদ্ধ-দেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।

"তে সাধকভক্তাঃ স্ব স্ব ভাবানুরূপং যদ্যদ্ধিয়া ভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুস্তেষাং সিদ্ধদেহং প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি।"—ভাঃ ৩। ৯। ১১ বিশ্বনাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতারপ্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু এক অভিন্ন পরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে লীলা প্রকট করেন, উহার আরম্ভ দ্বাপরে ব্রজলীলায় এবং পরিসমাপ্তি বর্ত্তমান কলিতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায়। ব্রজলীলায়

যাহা অপূর্ণ ছিল, নবদ্বীপলীলায় তাহাই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য মহাপ্রভুর অবতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের দুই মুখ্য কারণ বলা হইয়াছে—(১)—প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ইচ্ছা ও (২) রাগমার্গে ভক্তি প্রচারের ইচ্ছা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই দুই ইচ্ছারও মূল কারণ বলিতেছেন—"রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্‌গম।।" (চৈঃ চঃ আদি ৪। ১৬)। শ্রীকৃষ্ণ **রসিকশেখর**। শ্রুতি বলেন 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসস্বরূপ। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব, সুতরাং রসিক হিসাবেই তিনি ভেদশূন্য, আবার তিনি পরব্রহ্ম—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—সর্ব্ব বিষয়ে বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং রসাস্বাদন ব্যাপারেও তাঁহার মধ্যে পরাকাষ্ঠা। 'রস' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ হিসাবেও তিনি রস্যতে (আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ)—তিনি আস্বাদ্যরস এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি ইতি রসঃ)—তিনি আস্বাদন করেন অর্থাৎ রসিক। এখানে আস্বাদনকারী রসিক হিসাবেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

আবার শ্রীকৃষ্ণ **পরমকরুণ**। কারুণ্য তাঁহার স্বরূপগত গুণ। এই গুণের বশীভূত হইয়াই তাঁহার জীবকে উদ্ধারের চেষ্টা, "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২। ৬), এইজন্যই তাঁহার জীবের মধ্যে রাগমার্গে ভক্তিপ্রচারের ইচ্ছা। করুণা তাঁহার স্বরূপগত গুণ বলিয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধারের ইচ্ছা করেন — অপ্রকট লীলাকালে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়া, যুগাবতারাদিরূপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়া, আবার ব্রহ্মার এক কল্পে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাগমার্গে ভক্তিপ্রচার দ্বারা এবং পরবর্ত্তী কলিতে ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আপামর সাধারণকে অকুণ্ঠভাবে প্রেমভক্তি দিয়া, সর্ব্বকালে

জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে তিনি জীবকে উদ্ধারের ইচ্ছা করিতেছেন।

অবশ্য প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন তাঁহার নিজকার্য্য—'রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ' (চৈঃ চঃ আদি ৪। ১০৩)—এই রসনির্য্যাস আস্বাদনস্পৃহা পূরণের আনুষঙ্গিকভাবেই রাগমার্গে ভক্তিপ্রচার সাধিত হইয়াছে। "এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।। ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম।।" (চৈঃ চঃ আদি ৪। ৩২-৩৩)।

ভক্তের কিরূপ প্রেমরস আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর কৃষ্ণের লালসা, তাহা বলিতেছেন "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।" জগতের জীবের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মহিমাজ্ঞানই প্রবল, তাহাতে তাহাদের প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এরূপ প্রেমে তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। নিতান্ত মদীয়তাভাব না থাকিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। প্রাণমনঢালা সেবার মধ্যে যদি কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতি আসিয়া পড়ে, তখন সে ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়— প্রেম স্তিমিত হইয়া পড়ে। বাল্যবন্ধু দরিদ্র সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দেখিতে যাইবার সময় বন্ধুর জন্য কয়েক মুষ্টি চিড়া নিজ মলিন ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য দেখিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে সাহসী হন নাই,—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কংসবধের পর রামকৃষ্ণ যখন দেবকী-বসুদেবকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিতেছেন, তখন দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটনকালীন ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করায় তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল, কৃষ্ণ-বলরাম প্রণাম করিলে

তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতে শঙ্কিত হইলেন (ভাঃ ১০। ৪৪। ৫০-৫১)। মহিষী রুক্মিণীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাসচ্ছলে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবল প্রতাপ বীরগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা সঙ্গত হয় নাই, বিশেষতঃ তিনি আত্মারাম, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত ইত্যাদি কথায় শ্রীকৃষ্ণ যে কোন সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার হস্ত হইতে ব্যঞ্জন পতিত হইয়া গেল এবং নিজে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (ভাঃ ১০। ৬০ অঃ)। এখানে ভয়ে ও দুঃখে রুক্মিণীদেবীর কান্তা-প্রেম শিথিল হইয়া গেল।

সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মিক প্রেমের রস আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন না। তিনি এমন প্রেমরস আস্বাদন করিতে চাহেন যাহাতে প্রেমিকের তিনি অধীন হইয়া পড়িতে পারেন। এজন্য তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "অহং ভক্তপরাধীনঃ"—আমি ভক্তের অধীন। তিনি যে ভক্তিদ্বারা বশীভূত হন, শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী"।

যে প্রেমিক তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাপূর্ণ শুদ্ধভক্তি দ্বারা প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সম, এমন কি তাঁহার অপেক্ষা হীন মনে করিয়া তাঁহাকে পুত্র, সখা বা প্রাণপতিরূপে মনে করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অধীন হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।" (গী-৪। ১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— হে পার্থ, যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে (অর্থাৎ কর্ম্মমার্গেই হউক, জ্ঞানমার্গেই হউক, কিংবা অন্য যে

কোন মার্গেই হউক) আমার ভজন মার্গেরই অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি যদি কাহাকেও তাঁহার ভাবানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিতেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত। যে সমস্ত ভক্ত **কর্ম্মমার্গকে আশ্রয়** করিয়া আমাতে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগকে আমি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বররূপে তাহাদিগের অভীষ্ট ফল দিয়া থাকি। যে সকল **জ্ঞানমার্গের সাধক** আমার বিগ্রহকে মায়াময় এবং আমার জন্মকর্ম্মাদিকে নশ্বর মনে করিয়া আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নশ্বর জন্মকর্ম্মশীল মায়াপাশে পাতিত করিয়া তাহাদিগের প্রতিফল অর্থাৎ জন্মমৃত্যুদুঃখ দান করি। আবার যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক আমার জন্মকর্ম্ম নিত্য, আমার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ মনে করে, কিন্তু স্ব স্ব স্থূল ও লিঙ্গদেহের ধ্বংস বাঞ্ছা করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনায় আমাতে প্রপন্ন হয়, সেই মুমুক্ষুদিগকে ব্রহ্মানন্দ দান করিবার নিমিত্ত আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্মমৃত্যু ধ্বংস করি।"—(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার মর্ম্ম)। যাহারা আমার জন্মকর্ম্মাদিকে নিত্য মনে করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত আমাকে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে জন্মকর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য আমার ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহের নিত্যলীলাস্থল ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে নিজ পার্ষদ করিয়া যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া ও অন্তর্দ্ধান করিয়া তাহাদের ভজনফল প্রেমই দান করি। আবার আমার যে সকল শুদ্ধ ভক্তগণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে তাহাদের আপনজন জ্ঞানে প্রীতিপূর্ব্বক আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নিত্যসেবা করিয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে চায়, আমিও তাহাদিগকে সচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়া আমার মাধুর্য্যময় ব্রজধামের পরিকররূপে মাধুর্য্যময়ী লীলাতে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে নিত্যকাল সেবার অধিকারী করতঃ পরমানন্দ দান করিয়া থাকি। যাহারা যোগমার্গে

অবস্থিত হইয়া আমাতে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে আমার বিভূতি অর্থাৎ কৈবল্য প্রদান করিয়া থাকি *।

---

* "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে.........." এই শ্লোকটীর আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ মহাভ্রমাত্মক বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কেহ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা ভক্তি যে কোন সাধনপন্থা কিংবা শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শাঙ্কর যে কোন মতবাদই অবলম্বন করুন না কেন একস্থানেই পৌঁছিবেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা আধুনিক বহুল প্রচারিত 'যত মত তত পথ' কিংবা 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়' এই বিচারদ্বারা আশ্রয় করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া জনসমাজে বাহবা পাইতে ব্যগ্র। কিন্তু ইহার ফল 'To please everybody is to please nonbody' এবং বাস্তব সত্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া মাত্র। 'পথ' বলিতে যদি ভগবৎ প্রাপ্তির পথ লক্ষ্য হয়, তবে কি তাঁহাদের বিচারধারা অবলম্বন করিলে যে কোন পথেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

গীতায় ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য 'সর্ব্ব কর্ম্মের এক ফল' ইহা হইতে পারে না। ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রপন্ন, তাঁহাদিগের প্রপত্তির তারতম্যানুসারেই তিনি ফল বিধান করেন, কিন্তু অপ্রপন্ন ও প্রপন্নের একই ফল, তাহা বলা যাইতে পারে না। আবার যাঁহারা প্রপন্ন, তাঁহারা কি সকলে একই উদ্দেশ্য লইয়া প্রপন্ন হন? কর্ম্মী ইহকাল বা পরকাল ফলভোগের আশায়, জ্ঞানী ও যোগী মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের আশায় এবং শুদ্ধ ভক্ত কেবল শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্তির আশায় তাঁহাতে প্রপন্ন হন। সকলেরই আশয় বিভিন্ন। সুতরাং সকলে এক ফল পাইবেন—এক স্থানে পৌঁছিবেন, ইহা কিরূপে বলা যায়?

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"—মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন করে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি সবই তাঁহারই সৃষ্ট বা প্রকাশিত পথ এবং মনুষ্য তৎসৃষ্ট পথে চলিলে তাঁহারই পথের অনুবর্ত্তন করে, ইহা সত্য, কিন্তু যিনি যেরূপ পথের অনুবর্ত্তন করিবেন, তিনি সেই পথের ফল না পাইয়া সকল পথে এক ফল পাইবেন, ইহা বলা যাইতে পারে না—পথভেদে ফলভেদ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন শাক্ত,

পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাময় স্বসুখবাসনাশূন্য শুদ্ধ প্রেমময় ভক্ত জগতে দুর্ল্লভ। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে সকল শুদ্ধ প্রেমবান্ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পরিকরসহ গোলোকে নিত্যলীলা করিতেছেন, সেই সকল নিত্যপরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। *

বৈষ্ণব, মায়াবাদী, শুদ্ধ ভক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সব এক ইহা বলা যাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচার বিভিন্ন। সকলে যখন একই বিষয়ের প্রার্থনা ও তদনুরূপ সাধন করেন না, তখন সকলেই একফল পাইবেন, তাহা বলা যায় না। শাক্তগণ ধনজনাদির বিষয়ভোগ প্রার্থনা করেন, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মে লয় প্রার্থনা করেন, বৌদ্ধগণ প্রকৃতির লয় প্রার্থনা করেন, শৈবগণ মোক্ষের প্রার্থনা করেন—'শিবোঽহম্' হইবার প্রার্থনা করেন। আবার বৌদ্ধগণ বেদ মানেন না, বৈদান্তিকগণ বেদকেই অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া থাকেন, শাক্তগণ জড় মহামায়াকেই আদ্যাশক্তি বা মূল কারণ বলিয়া মনে করেন, শৈবগণ তদ্রূপ শিবকে মূল কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের বিচার বিভিন্ন, সাধন বিভিন্ন, সুতরাং প্রাপ্য ফলও বিভিন্ন হইবে।

* স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কাল ঃ—

ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগে এক দিব্যযুগ হয়। ৭১ দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি একাত্তরবার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে এক মন্বন্তর বলা হয়—ঐ পরিমাণ কাল এক মনুর অধিকার থাকে। এইরূপ ১৪টী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন বা এক কল্প বলা হয়। এইরূপ ৩০ কল্পে ব্রহ্মার ১ মাস এবং ১২ মাস এক বৎসর হয়। এই পরিমাণের ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। তাহা হইলে ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই প্রত্যেকের ৯৯৪টী যুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মার একদিনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রত্যেকের

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য বা গূঢ় কারণ বলা হইল। শাস্ত্রে কৃষ্ণ অবতারের আরও একটী কারণ উল্লিখিত আছে। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত আছে যে, অসুরপ্রকৃতি রাজগণের উৎপীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া প্রতীকার লাভের জন্য গাভীরূপ ধারণ করতঃ ব্রহ্মার নিকট উপনীতা হইয়া নিজ দুঃখ-কাহিনী জানাইলে, ব্রহ্মা শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ক্ষীরসমুদ্রতীরে গিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রীনারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আকাশবাণীতে ব্রহ্মা অবগত হইলেন যে, ভূভার হরণের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহে জন্মলীলা প্রকট করিবেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন।।" (চৈ চঃ আদি ৪। ৮)। পৃথিবীর ভার গ্রহণ কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে। তাঁহার স্বাংশাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উপরই তিনি এই কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন। বিষ্ণুই সাক্ষাৎভাবে জগতের পালনকর্ত্তা, অসুর সংহারাদি দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করা তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিতেছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

১০০০ যুগ আছে। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার এক দিনে) ব্রহ্মার ১৪ জন পুত্র মনু নামে খ্যাত হন। ১৪ জন মনুর নাম—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষ সাবর্ণি, (১০) ব্রহ্ম সাবর্ণি, (১২) রুদ্র সাবর্ণি, (১৩) দেব সাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্র সাবর্ণি। বর্ত্তমান কালে ছয় মনুর রাজত্বকাল (৬ মন্বন্তর) অতীত হইয়াছে, ৭ম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে। মনুষ্যমানে মোটামুটিভাবে কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ কলিযুগের দ্বিগুণ, ত্রেতাযুগের পরিমাণ কলিযুগের তিনগুণ এবং সত্যযুগের পরিমাণ কলিযুগের চতুর্গুণ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (গী-৪। ৭)

কিন্তু আবার শাস্ত্রে উক্ত আছে যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার এক কল্পমধ্যে একবারমাত্র অর্থাৎ কোটি কোটি যুগ পরে একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন না। যুগে যুগে যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি যুগাবতার। ভূভার হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ হন, স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। "সম্ভবামি যুগে যুগে"—উহার তাৎপর্য্য যুগে যুগে তিনি যুগাবতাররূপেই অবতীর্ণ হন, স্বয়ংরূপে নহে। যুগাবতার তাঁহারই এক স্বরূপ, এজন্য গত দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে। ভূভার হরণের সহিত যদি তাঁহার সাক্ষাদ্‌ভাবে কোন সম্পর্ক থাকে, তবে তাঁহার অবতরণকে বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক সেই সময়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল। যখন পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তখন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকাচতুর্ব্যূহ, পরব্যোম চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অংশাবতারগণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ, যুগাবতারগণ, মন্বন্তর অবতারাদি সকল ভগবৎস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন—স্বতন্ত্র বিগ্রহে নহে। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্। যখনই কোন পূর্ণ বস্তু প্রকাশিত হন, তখন সমস্ত অংশই ঐ বস্তুর সহিত সম্মিলিত থাকে, নতুবা তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।।" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ১০)। শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন—উহাতে বুঝিতে হইবে জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহমধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঐ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

"অতএব বিষ্ণু তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।।" শ্রীকৃষ্ণকে কংসারি বলা হয়, কারণ তিনিই মূলস্বরূপ। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও নহে, কারণ আকাশবাণীতে এই কথাই বলা হইয়াছিল "পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ"—ভাঃ ১০। ১। ২২। দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত থাকাকালে ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০। ২। ৩৯) তাহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন "অস্মদ্বিজ্ঞাপিতোঽস্মদাদি পালনার্থম-বতীর্ণোঽসি ইত্যস্মাকমভিমান এব"—আমাদের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা মনে করিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে এই ভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের প্রয়োজনীয়তা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের লীলা অপ্রকট করিয়া চিন্তা করিতেছেন—বহুকাল পূর্ব্বে (অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পের দ্বাপরে যখন আমি স্বয়ংরূপে একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলাম তাহার পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে) আমি জগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলাম। তারপর অনেককাল (কোটি কোটি যুগ) অতীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব প্রদত্ত প্রেমভক্তিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জগতে ভক্তিমার্গের যে অনুষ্ঠান আছে, উহা বিধিভক্তির অনুষ্ঠানমাত্র, উহাতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের সংসার গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখকষ্ট পায়, স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিত্য অবস্থানের উপায় নাই, অথচ ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত উহা হওয়া সম্ভব নহে—'ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান' (চৈঃ চঃ আদি ৩। ১৪)।

ভক্তিমার্গ ভিন্ন জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও জীব মোক্ষলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২। ১৭)। আবার ভক্তির সাহায্যে যোগজ্ঞানাদির দ্বারা মোক্ষ লাভ করিলেও তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিতি নাই—মুক্ত জীবও নিজের অবস্থায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য তাঁহাদের ভজনের কথা শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" (নৃসিংহ-তাপনী)।

সাধারণভাবে ভক্তিমার্গের সাধনেও জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সম্ভাবনা নাই। জগতে বিধিভক্তির অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু এই বিধিভক্তি শুধু শাস্ত্রানুশাসনের ভয়েই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। চারি বর্ণাশ্রমীও যদি স্বধর্ম্ম করিয়া কৃষ্ণভজন না করে, তবে নরক-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি নাই—ইত্যাদি শাস্ত্রাদেশ শুনিয়া নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ের সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার কথা চিত্তে জাগরূক থাকে। পাপকর্ম্ম-জনিত নরকযন্ত্রণা, পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি সুখভোগের সকলেরই কর্ম্ম-ফলদাতা তিনি এবং এই সকল কর্ম্মফল হইতে একমাত্র তিনিই নিষ্কৃতি দিতে পারেন—এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া জীব ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এইরূপ বিধিমার্গের ভজনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধামই সাধকের প্রাপ্য হইতে পারে, সার্ষ্টি আদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও হয়ত লাভ করিতে পারেন। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা।।" (চৈঃ চঃ আদি ৩। ১৭)। কিন্তু এই বিধিমার্গের ভক্তি অনুষ্ঠানেও সাধকের আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ হয় না। যত সময় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্য আস্বাদন করা না যায়, তত সময় যাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এমন কি পরব্যোমস্থিত শ্রীভগবানের

স্বরূপগণও এবং তাঁহাদের লক্ষ্মীগণও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন—"ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তাঁ সবার বলে হরে মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।।" চৈঃ চঃ মধ্য ২১। ১০৬।

সুতরাং যেরূপ ভজনে ব্রজের প্রেমসেবা লাভ করা যাইতে পারে তাহা অর্থাৎ রাগানুগভাবে প্রেমভক্তি লাভের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন। বর্ত্তমান কল্পে দ্বাপরে তিনি যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি প্রেমভক্তিলাভের উপদেশাদি দিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাতে শরণাগতি ও তাঁহাতে বিশুদ্ধা অনন্যা বা কেবলা ভক্তিই তাঁহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। গীতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কথা থাকিলেও প্রতি সাধনে ভক্তিই প্রধানীভূতা। ভক্তিই কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরমাশ্রয়। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি।' (গী ১৮। ৫৫)। 'ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ' গী ১১। ৫৪—ইত্যাদি শ্লোকে বিশুদ্ধা অনন্যা কেবলা ভক্তিই জীবের চরম উদ্দেশ্য এবং অনন্য ভক্তিমান্ ভক্তের ভক্তিতে তিনি বশীভূত। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং".............(গী ৯। ২২) ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই অনন্যা ভক্তি কিরূপে সাধন করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং"..............(গী ৯। ১৪) —আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন অর্থাৎ নববিধা ভক্তির যাজন। সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশও দিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।" (গীঃ ১৮। ৬৫) এবং সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা, পাণ্ডিত্য, আত্মকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতেই শরণাগতির কথা—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" (গী ১৮। ৬৬)।

কিন্তু শুধু মৌখিক উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ-ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পরমকরুণ শ্রীভগবান্ সেজন্য

সাধক ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে আচরণ করিয়া জীবকে প্রেমভক্তিলাভের শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। [জীবের স্বরূপগত ভাব কৃষ্ণদাসত্ব বা সেবকত্ব, শ্রীভগবানের স্বরূপগত ভাব সেব্যত্ব—তথাপি করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্তভাব গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন]।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য কারণ—(১) প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গে ভক্তির প্রচার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ব্রজলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। রাগানুগভাবে প্রেমভক্তি লাভের উপদেশাদিও তিনি প্রচুরভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে দিয়াছেন। দ্বাপরের ব্রজলীলা অপ্রকটের পর তিনি দেখিলেন যে পূর্ব্ব প্রদত্ত প্রেমভক্তি কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অথচ একমাত্র রাগানুগভাবে ভক্তিসাধনদ্বারা লভ্য ব্রজের প্রেমসেবা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ সম্ভবপর নহে। উক্ত স্থিরতা লাভ করিতে হইলে ব্রজের প্রেমসেবালাভ জীবের সাধ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন এবং উহার সাধন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই দুই বস্তুর শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সাধকভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে উহা অনুষ্ঠান করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন—'আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।।'' (চৈঃ চঃ আদি ৩। ২০)। নিজে আচরণ করিবেন যেহেতু সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের আচরণের অনুকরণ করিয়া থাকে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।। (গী ৩। ২১)

যুগধর্ম্মনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা শ্রীভগবান্ জীবের মধ্যে প্রেম-ভক্তির উন্মেষ করেন। এই কার্য্য যুগাবতারদ্বারাও সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্যটী অর্থাৎ ব্রজপ্রেমরূপ ভক্তির পরমাবস্থা যাহা তাহা

একমাত্র তিনি ভিন্ন তাঁহার কোন অংশাবতার দ্বারা সম্ভবপর নহে—"যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।" (চৈঃ চঃ আদি ৩। ২৬)। * এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলার যোগে অন্যের অদেয় ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত 'ব্রজপ্রেম' অবিচারে মরজগতে বিপুলভাবে বিতরণ পূর্ব্বক তাঁহার পরমাশ্চর্য্য ঔদার্য্য প্রকাশ করিবেন। এই চিন্তা করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কলির প্রথমভাগে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন—তাঁহার কোন অংশাবতার যে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন তাহা নহে।

[কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান্ কখনও একাধিক হয়েন না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বাবতারী তাহা প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হইতে পারে। একমেবাদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই আবির্ভাব, বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়েন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণেও তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পূর্ণজ্ঞান বা পরিপূর্ণ চেতনা এবং তৎ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় বিবিধ শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে উহার যথাযথ স্বরূপ জগতে বিদিত ছিল

---

* 'সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।' (লঃ ভাঃ)। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণব্যতীত কেইবা লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন?—অর্থাৎ আর কেহই নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে। তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমনকি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—'ত্রৈলোক্য-সৌভগম্.......' ইত্যাদি ভাঃ ১০। ২৯। ৪০।

না। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জানা শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কাহারও সামর্থ্য নাই; তাই তাঁহারই অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবার তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে জানাইলেন ও তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ও জানাইলেন—শুধু উপদেশদ্বারা নহে, স্বয়ং আচরণ করিয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নদীয়ায় অবতরণ সম্বন্ধেও কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে শ্রীভগবানের প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে সংস্পর্শ কিরূপে হইতে পারে? উহার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীভগবানের ধাম সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা। উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা।।" "ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।" (চৈঃ চঃ আদি ৫। ১৮-১৯)—শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু, তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভু (সর্ব্বব্যাপক)— সেজন্য যে কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার ধামের সংক্রমণ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারকালে শ্রীভগবানের নিত্য চিন্ময় নবদ্বীপধামও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলাবসানের পরও উহার চিন্ময়ত্বের হানি হয় নাই।

সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণেরই একটী আবির্ভাব-বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ—'কৃষ্ণস্বরূপ' ('নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্') —"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্" একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের 'আবেশাবতারগণ' বা 'স্বাংশাবতারগণ' (তদেকাত্মরূপ অবতারগণ) এমন কি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন 'প্রকাশ' মধ্যেও গৌরসুন্দর উক্ত হয়েন নাই— যেহেতু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।]

গৌরসুন্দররূপে আবির্ভাবের বিশেষত্ব ছন্নলক্ষণে শাস্ত্রাদিতে নিহিত আছে। শ্রীভগবান্ পরোক্ষ-প্রিয় *—এজন্য তিনি নিজেও বেদাদি শাস্ত্রে

---

* 'বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্।।' (ভাঃ ১১।২১।৩৫)—ত্রিকাণ্ডবিষয়ক এই বেদসকল

অনাবৃতভাবে নির্দ্দিষ্ট হন নাই। সাধারণতঃ তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে উপলব্ধি দুর্ল্লভ হইলেও গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কতকটা স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অবতার সকলের প্রপঞ্চে অবতরণ প্রকাশ্যভাবেই হইয়া থাকে—এই সকল বিবরণ শাস্ত্রে কতকটা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ গৌরকৃষ্ণ আবির্ভাবটী আরও পরোক্ষতার আবরণে প্রচ্ছন্ন, সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহাকে "ছন্নঃ কলৌ" (ভাঃ ৭। ৯। ৩৮) বলিয়াছেন। তাঁহার অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ এরূপ ছন্ন নহেন। এজন্য শাস্ত্রসকল তাঁহার ছন্নলক্ষণের ব্যতিক্রম না করিয়া তাঁহাকে কেবল বিশেষণের দ্বারাই সবিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। * ঐসকল কারণের জন্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উপলব্ধি অপেক্ষাও সুদুর্ল্লভ ও সাধুমহাজনদিগের কৃপাসাপেক্ষ। এমনকি সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসম মহাপণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে না পারার অভিনয় করিয়াছিলেন।

গৌরসুন্দররূপ অবতারের মূলকারণ—এখন শ্রীকৃষ্ণের গৌর-সুন্দররূপে আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের দুই মূল কারণ—(১) প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গ ভক্তি প্রচার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের অবতরণেরও দুই মুখ্য কারণ বলিতেছেন—"দুই-হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেমনাম-সঙ্কীর্ত্তন।।"

ব্রহ্মাত্মবিষয়ক (আত্মার ব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন, সংসারিত্ব প্রতিপাদন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে), ঋষিগণও পরোক্ষভাবেই (স্পষ্ট না বলিয়া অন্যভাবে) উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেহেতু পরোক্ষভাবই আমার অভিপ্রেত।

* নিমি মহারাজের নিকট শ্রীকরভাজনের উক্তি—কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহ-কৃষ্ণং ইত্যাদি ভাঃ ১১। ৫। ৩২

(চৈঃ চঃ আদি ৪।৩৯)—(১) **প্রেম আস্বাদন ও (২) নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন।** প্রেম আস্বাদন ও নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) বিষয়জাতীয় আস্বাদন ও (২) আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন। যিনি প্রেমের 'বিষয়' অর্থাৎ ভক্তগণ যাঁহাকে প্রেমসেবাদ্বারা সুখী করিতে চেষ্টা করেন, তিনি সেবিত হইয়া একরূপ সুখ আস্বাদন করেন—এখানে তিনি প্রেমের 'বিষয়'। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বপ্রভু— ‘‘একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য’’ (চৈঃ চঃ আদি ৫। ১৪২)। ব্রজলীলায় সর্ব্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়' রূপে প্রেমের আস্বাদন করেন। আবার এই প্রেমসেবাসুখ ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া আশ্রয় করে, সেজন্য ভক্তগণ হইতেছেন সেই সুখের 'আশ্রয়'— তাঁহারা 'আশ্রয়' জাতীয় সুখের আস্বাদন করেন। ভক্তগণের প্রেম-সেবা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণ সুখ আস্বাদন করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। [প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই, জননীর ভালবাসা পাইয়া সন্তান (ভালবাসার 'বিষয়') যে পরিমাণ সুখ পায়, সেই সুখের 'আশ্রয়' জননী সন্তানকে ভালবাসিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ আস্বাদন করেন।] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় সুখের পরিপূর্ণ আস্বাদক হইলেও ব্রজলীলায় তিনি আশ্রয়রূপে প্রেম আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এই আশ্রয়রূপে প্রেম আস্বাদন স্পৃহা তিনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা পূরণের ইচ্ছায়ই তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদনও 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' রূপে দুইভাবে হইতে পারে— ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে নামের আস্বাদন করিয়াছেন—ভক্তগণ তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সুখ দিয়াছেন। কিন্তু আশ্রয়রূপে (ভক্তভাবে) উহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই—তাই নবদ্বীপলীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া (আশ্রয়রূপে ভক্তেরই প্রাপ্যসুখ) ব্রজপ্রেম ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে হইলে কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিবেন? দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের অনেক ভক্ত আছেন, কিন্তু তন্মধ্যে মধুরভাব বা কান্তাভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ এই মধুরভাবের মধ্যে অন্যসকল ভাব অন্তর্ভুক্ত। নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীগণ কোনরূপ শাস্ত্রানুশাসনের অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র লালসার বশীভূত হইয়া বেদধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, সমাজশাসন, অন্যকাহারও উপাসনা ও সমস্ত বিধিনিষেধের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন— সেই রাগাত্মিকা মধুরভাবের আশ্রয়—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বোত্তমা। ব্রজবধূগণের কান্তা প্রেমের চরমপরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব। এই মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকা। অন্য গোপীদের মধ্যে ইহা নাই—মাদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য স্তর তাঁহাদের মধ্যে আছে। অন্য গোপীদিগের তুলনায় শ্রীরাধার প্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য। একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বোত্তম প্রেমরস আস্বাদন করিতে সেই প্রেমের অধিকারিণী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকারই ভাব গ্রহণ করিলেন। ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিও গ্রহণ করিলেন—যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদন করিয়া গৌরাঙ্গ হইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নামপ্রেম আস্বাদন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন? সাধারণতঃ দেখা যায়, একজনের ভাব আর একজন গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এমনই বিশেষ সম্বন্ধ, যাহাতে শ্রীরাধার ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের গ্রহণ করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে, তাহা দেখান'র জন্য কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপদামোদর গোস্বামীর স্বরচিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।”

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের বিকার অর্থাৎ ঘনীভূত অবস্থা, সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। * শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ রাধা ও কৃষ্ণ একাত্মা। একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতে গোলোকে পৃথক্ দেহে বিরাজ করিতেছেন। এক্ষণে (বর্ত্তমান কলিযুগে) সেই দুই দেহ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ এই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

ভক্তভাবে প্রচ্ছন্নাবতার হইলেও ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনে সেই প্রচ্ছন্নত্ব আর থাকে না। তাই শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর অন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। দুই পৃথক্‌তনু একীভূত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী অবস্থা (একীভূত হইয়া যাইতেছেন এইরূপ একটী অবস্থা) মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরায়রামানন্দেরও প্রেমদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। মহাপ্রভুর সহিত সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে কথোপকথনের পর রায়রামানন্দ তাঁহাকে তাঁহার একটী সংশয়ের কথা বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীরূপ ছিল, কিন্তু রামানন্দের প্রেমদৃষ্টিতে তিনি পর পর বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতেছেন। **প্রথমদর্শনে** স্ফূর্ত্তি হইল—সন্ন্যাসরূপ স্থলে এক ‘শ্যামগোপরূপ’ অর্থাৎ শ্যামসুন্দর গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ। **দ্বিতীয় দর্শনে** স্ফূর্ত্তি

---

* শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম, সেজন্য প্রেম ও প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়াই শ্রীরাধা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি—হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপা—হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আনন্দিত করেন বলিয়া উহার নাম হ্লাদিনী। এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করেন। হ্লাদিনীর বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি।

হইল—শ্রীকৃষ্ণ এবং সন্নিকটে স্বর্ণ-প্রতিমা-স্বরূপা শ্রীরাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতা শ্রীরাধিকা। **তৃতীয় দর্শনে** যে রূপ স্ফূর্ত্তি হইল তাহা এইরূপ—স্বর্ণ গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকার গৌরকান্তি-চ্ছটায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবদনে বংশীটি সংলগ্ন রহিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নানাভাববিলাসে তরঙ্গায়িত নয়নকমল তখনও চঞ্চল। রামানন্দরায়ের চক্ষুতে স্ফুরিত এই রূপটী শ্রীগৌরসুন্দরের নিজরূপের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌররূপে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী। তৃতীয় দর্শনের এই রূপটী দেখিয়া রামানন্দ বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় দর্শনের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ) রূপটী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন নাই, কারণ পূর্ব্বলীলায় বিশাখাস্বরূপে তাঁহার নিত্যসেব্য এই রূপটী তাঁহার চিরপরিচিত এবং ইহার দর্শনের আনন্দেও তিনি অভ্যস্ত। তৃতীয় রূপ দর্শনে (অপূর্ব্ব মিলনোন্মুখীরূপ) বিস্মিত হইয়া সংশয় দূরীকরণের জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। ছন্ন অবতার মহাপ্রভু প্রথমতঃ আত্মগোপন করিবার জন্য বলিলেন যে, রাধাকৃষ্ণে মহাপ্রেমবশতঃ তাঁহার হৃদয়ে এই মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। রামানন্দ কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি প্রভুর এই 'ভারিভূরি' ছাড়িয়া গূঢ় কারণ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। ভক্তের অভিমানের নিকট ভগবান্ পরাজিত হইলেন। তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজস্বরূপটী রায়কে দেখাইলেন। **চতুর্থ দর্শনে** রামানন্দ দেখিলেন—'রসরাজ, মহাভাব দুই একরূপ'—সাক্ষাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা একীভূত হইয়া গৌরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এমন নিবিড়তম মিলন যে, শ্রীরাধার ভাবটী তাঁহার অন্তরে পরিস্ফুট এবং অঙ্গকান্তিতে গৌরসুন্দরের অঙ্গ সমুজ্জ্বল। এ রূপ দেখিয়া রামানন্দ আনন্দাধিক্যবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীকরস্পর্শে চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। পরতত্ত্বের চরমতম অবস্থা যাহা, তাহাই

শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকটিত হইল, এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—এই জগতে শ্রীচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।]

মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহার কড়চায় অবতারের যে অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন, তাহা এই—

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো
> যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
> সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি
> লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

অন্তরঙ্গ কারণটীর তিনটী অঙ্গ—(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ? (২) শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ? এবং (৩) সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ?—এই তিনটী আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় করিতে পারেন নাই। এই তিনটী লালসা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—(১) প্রেম আস্বাদন ও (২) নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন। উহাতে বুঝা যায়, বর্ত্তমান শ্লোকবর্ণিত তিনটী বাসনাপূরণের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের হার্দ্দ্য বা মুখ্যকারণ। "অনর্পিতচরীং * *" শ্লোকেও বলা হইয়াছে — শ্রীভগবান্ কলিতে উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। নামপ্রেম আস্বাদন বা বিতরণও সত্য কারণ সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই ঐসকল অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। সেজন্য ঐসকল কারণ গৌণ বা বহিরঙ্গ কারণ। মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ এখন বলা হইতেছে।

প্রথম বাসনা শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কিরূপ?—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি সমস্ত রসের আধার, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব, আমার কোন অভাব নাই, তথাপি রাধা-প্রেমের অদ্ভুত মহিমা আমাকে এত চঞ্চল করিয়াছে যে, আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই। 'না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।। রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্যনট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।' (চৈঃ চঃ আদি ৪। ২৩, ১২৪)। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল রাধার প্রেমসেবাসুখ আস্বাদন করিতেছেন। তথাপি রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য তিনি চঞ্চল কেন? তদুত্তরে কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেম আস্বাদন করেন বটে কিন্তু উহা প্রেমের বিষয়রূপে—আশ্রয়রূপে সেই আস্বাদনে কোটিগুণ সুখ বেশী। সেজন্য প্রেমের 'আশ্রয়' রূপে (শ্রীরাধার ন্যায়) তাঁহার প্রেমাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এত ব্যাকুল।' ''নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ।। * * সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'।। * * আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়।। কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।।'' (চৈঃ চঃ আদি ৪)

দ্বিতীয় বাসনা নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আমার মধুরিমা অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ, ত্রিজগতে উহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে কেহ সমর্থ নহেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই ('রাধিকা একলি') উহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ। [কৃষ্ণ মাধুর্য্যের অদ্ভুত মহিমার কথা প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার প্রেমেরও অদ্ভুত মহিমা ব্যক্ত হইল] রাধাপ্রেম বিভু, অনন্ত, সেজন্য একমাত্র তিনিই অনন্ত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের অন্য পরিকরগণ তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, কিন্তু উহা পরিপূর্ণ আস্বাদন

নহে। কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমের 'নির্ম্মল সৎপ্রেম-দর্পণে' শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে। রাধার প্রেম বিভু হইলেও প্রতিক্ষণেই উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উহার নিবৃত্তি নাই, সেজন্য মাধুর্য্য আস্বাদনের চমৎকারিতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়—"আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে।।" শুধু যে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে রাধার প্রেম বর্দ্ধিত হয় তাহা নহে—রাধাপ্রেমের আস্বাদনে কৃষ্ণমাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্য উভয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে—যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াই উহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না—"মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি'। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি।।"

দর্পণ মণিভিত্তি প্রভৃতিতে নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনে লোভ জন্মে, কিন্তু তাঁহার নিজের আস্বাদনের উপায় নাই। শ্রীরাধার প্রেমই তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায়, ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক রাধিকাস্বরূপ হইয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাসনা পূরণের উপায় যে একমাত্র শ্রীরাধিকার ভাবগ্রহণ উহাই বুঝাইতেছে। দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, উহা আস্বাদনের জন্য তাঁহার কেন এই বলবতী লালসা জন্মিল তাহার কারণ বলিতেছেন—তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের স্বাভাবিকী শক্তি এমন যে উহা সমস্ত নরনারীকে তো আকর্ষণ করেই এমন কি স্বয়ং তাঁহা-কেও আকর্ষণ করিয়া চঞ্চল করে—"কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।" [কেবল যে ভাগ্যবান্ জীবকে আকর্ষণ করে তাহা নহে, অন্যত্র উক্ত আছে—"ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তাঁ সবার বলে হরে মন। পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২১। ১০৬)]। তাঁহার মাধুর্য্যের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অমৃত সদৃশ, সেজন্য উহার আস্বাদনের লালসা কখনও প্রশমিত হয় না—যত আস্বাদন করা যায় ততই আস্বাদনের লালসা বাড়িতে থাকে— "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর"—তাই অতৃপ্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দর্শনের জন্য পলকবিহীন কোটি কোটি নেত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন (প্রমাণ ভাঃ ১০। ৩১। ১৫, ১০। ৮২। ৩৯)। তাঁহার এমন যে অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য তাহা নিজে সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না, সেজন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায়, মাদনাখ্য মহাভাবই সম্যক্‌রূপে উহা আস্বাদনে সমর্থ। এই ক্ষোভ নিবৃত্তির জন্যই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতরণের হেতু।

চৈতন্যাবতারের অন্তরঙ্গকারণভূতা দ্বিতীয় বাসনার (স্বমাধুর্য্য আস্বাদন) কথা বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এখন তৃতীয় বাসনার কথা বলিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে বলা হইয়াছে। কোনস্থানে বলা হইয়াছে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য, কোনস্থানে বলা হইয়াছে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ দান করিবার জন্য, আবার কোনস্থানে বলা হইয়াছে পাষণ্ডের অত্যাচার হইতে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণের উদ্ধার ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মহাপ্রাণ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের জল-তুলসীসংযোগে করুণাময় শ্রীহরির নিকট আকুল আহ্বানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বিদ্বৎ-অনুভবে যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার স্বলিখিত কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ মুখ্যকারণ অন্যপ্রকার। যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, জগতে প্রেমভক্তি দান বা শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের আকুল

আহ্বানে সাড়া দেওয়া—এইগুলি ঐ অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সাধনেরই অন্তর্ভুক্ত বা আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ মাত্র।

আনন্দরসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় যে প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় নাই। আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) বিষয়জাতীয় আস্বাদন ও (২) আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন। এবিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আশ্রয়জাতীয় সর্ব্বোত্তম প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য রসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিলেন। ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিও গ্রহণ করিলেন, যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদন করিয়া রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া শৃঙ্গাররস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভ-রস-বিগ্রহ গৌরসুন্দররূপে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন (আশ্রয়জাতীয়) এবং ঔদার্য্যরসবিগ্রহরূপে নামপ্রেম আস্বাদন, যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী প্রেমভক্তি দান, প্রেমভক্তিবিরোধী পাষণ্ডীদিগকে সংহার না করিয়া নামকীর্ত্তনদ্বারা তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীকরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রেমসম্পত্তির অধিকারী করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আশ্রয়রূপে প্রেমরস আস্বাদন বাসনা তিনভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—(১) শ্রীরাধার প্রেমমহিমা কিরূপ তাহা জ্ঞাত হওয়া (২) শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদিত নিজমাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং (৩) তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান সেই সুখই বা কিরূপ?—এই তিনটী অপূর্ণ বাসনা পূরণ করিবার লালসায় শ্রীরাধার সহিত একীভূত ও তদ্ভাবকান্তিমণ্ডিত হইয়া তিনি শ্রীশচীগর্ভে শ্রীগৌর-সুন্দররূপে আবির্ভূত হইলেন। এই বাসনা পূরণের দ্বারা প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনই তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। যখন তিনি এই বাসনা পূরণের সঙ্কল্প করিলেন তখনই যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐ

একই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণাবতারের জন্য আরাধনা করিতেছিলেন। সুতরাং যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ও প্রেম প্রচার বা অদ্বৈতাচার্য্যের আকুল আহ্বানে সাড়া দেওয়া—এইগুলি আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ মাত্র। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।।"

(চৈঃ চঃ আদি ৪। ২২২-২২৩)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনিই মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার। ঐ শৃঙ্গার রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী আস্বাদন করাই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। ব্রজলীলায় শৃঙ্গার রসের আংশিক (বিষয়জাতীয়) আস্বাদন করিয়াছেন। অবশিষ্ট (আশ্রয়জাতীয়) অংশটুকু আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং উহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ। এই আশ্রয়জাতীয় শৃঙ্গার রসের অশেষ-বিশেষভাবে বৈচিত্রী আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিকভাবে অন্য সমস্ত রসের বিশেষতঃ কলিযুগধর্ম্ম নাম ও প্রেম প্রচার করিলেন।

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের 'আশ্রয়'ও বলা হইয়াছে। এখানে তাঁহাকে প্রেমের 'বিষয়' বলা হইতেছে। সুতরাং এই পারিভাষিক দুইটী শব্দ 'আশ্রয়' ও 'বিষয়' সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থ জানা আবশ্যক। যাহাতে প্রেম থাকে অর্থাৎ যিনি প্রেমাস্পদকে প্রেমের সহিত সেবা করেন বা প্রীতি করেন তিনি প্রেমের 'আশ্রয়' এবং যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ প্রেমের সহিত যাঁহাকে সেবা করা হয়—যাঁহাকে প্রীতি করা হয় বা মমতার সহিত ভালবাসা যায় সেই প্রেমাস্পদকে

প্রেমের 'বিষয়' বলা হয়। যেমন মাতৃস্নেহ ও সন্তান—মাতার চিত্তে স্নেহ অবস্থিত থাকে উহা তিনি সন্তানের প্রতি প্রয়োগ করেন—এস্থলে মাতা স্নেহের 'আশ্রয়' এবং সন্তান স্নেহের 'বিষয়'। গোপীদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পরিকরদিগের চিত্তে প্রেমের অবস্থিতি—তাঁহারা ঐ প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন এখানে গোপিগণ বা পরিকরগণ প্রেমের 'আশ্রয়' এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 'বিষয়'।]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধিকার প্রেমবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে 'মহাভাব' সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। অনধিকারীর পক্ষে এই সকল রসবিচারের আলোচনা করিতে যাওয়া মূঢ়তা ও অপরাধজনক। এই সব তত্ত্ব অনুভবসাপেক্ষ—রসিক ভক্তগণের অনুভবে ইহা বেদ্য। তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে কৃপা-শিক্ষা দিয়াছেন তদবলম্বনে উহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইতেছে। পাঠকগণ এজন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রেমবিকাশে 'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'ভাব' ও 'মহাভাব' এই কয়েকটী বিভিন্ন স্তর।

মহাভাবের আবার 'মোদন' ও 'মোহন' দুইটী বিভিন্ন ভাব আছে। 'মোদনে'র আবার দুইটী অবস্থা—(১) 'মাদন' ও 'মোহন'—

"অধিরূঢ়-মহাভাব—দুইত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে 'মোহন' নাম তার।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩। ৫৪)

'মাদন'—'মোদনে'র যে ভাবে শুধু সম্ভোগ বা মিলনানন্দ, তাহাকেই 'মাদন' বলা হয়। উহাতে বিরহের অভাব। শ্রীরাধিকার মধ্যে এই ভাব উদিত হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিকাদি ভাবের প্রকাশ হয়। এই ভাবটী হ্লাদিনীর চরম পরিণতি। শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কাহারও

মধ্যে এই ভাবটী নাই—ইহা শ্রীরাধার নিজস্ব সম্পত্তি। এই ভাবটী শ্রীরাধার যূথের অন্য কোন সখীরও নাই। এমনকি রসস্বরূপ ও রসের ভোক্তৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। সমগ্র ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা—মিলনানন্দের মত্ততাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

'মোহন'—'মোদনে'র যে ভাবে বিরহাবস্থা—বিরহজনিত বিবশতা হেতু সুদ্দীপ্ত—সু (সম্যক্‌রূপে) উদ্দীপ্ত (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) সাত্ত্বিকভাব (কম্প, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, পুলকাদি) প্রকাশিত হয়। উহাতে কেবল বিরহকাতরতা। শ্রীরাধিকাতে প্রায় (বাহুল্যে) এই মোহন ভাব প্রকাশিত হয়।

প্রেমবিকাশের স্নেহ হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত যে স্তরের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে ঐ সকল স্তরের মধ্যে 'স্নেহ' হইতে 'মোহন' (মহাভাবের বিরহ অবস্থার ভাব) পর্য্যন্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজগোপীদিগের মধ্যে আছে। ব্রজগোপীগণ এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরে প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রেমের 'বিষয়'। আবার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই প্রেমের এই সমস্ত স্তর ('স্নেহ' হইতে 'মোহন' পর্য্যন্ত) আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উহার 'আশ্রয়'ও বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রেমবিকাশের সর্ব্বশেষ স্তর অর্থাৎ মহাভাবের 'মাদন'রূপ ভাবটী শ্রীকৃষ্ণে নাই। শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কাহারও মধ্যে এই ভাবটী নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য মহাভাবের 'আশ্রয়' নহেন। ঐ ভাবের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধিকা। ঐ ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য মহাভাবের 'বিষয়' মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐ মাদনাখ্য মহাভাবটী নাই অথচ তিনি অনুভব করিতেছেন যে ঐ মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকা ঐ প্রেমের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া যে আনন্দ পান উহা তিনি সেবালাভ করিয়া (অর্থাৎ প্রেমের বিষয়রূপে) যে আনন্দ পান তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক। তাই এই আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণে লোভ জন্মে। ব্রজলীলায়

তাঁহার যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল তাহার প্রথম বাসনা মাদনাখ্য প্রেমের আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন। তাই এই বাসনা পূরণের জন্য শ্রীরাধার প্রেম মহিমা কিরূপ তাহা জানিবার লোভ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে প্রথম বাসনার কথা আলোচিত হইয়াছে। **এখন তৃতীয় বাসনা**—"সৌখ্যং চ অস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"—অর্থাৎ আমাকে অনুভব করিয়া (সেবাদ্বারা আমার সুখ বিধান করিয়া) শ্রীরাধার কিরূপ সুখলাভ হয়?—ইহার আস্বাদন।

শ্রীরাধিকার 'সৌখ্য' বলিতে কি বুঝায়? শ্রীরাধিকা স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপা। এই হ্লাদিনীর কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে (এবং ভক্তগণকেও) আহ্লাদিত করা "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—হ্লাদিনী"— সেই শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন—"সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করাই শ্রীরাধিকার একমাত্র স্বরূপগত কার্য্য। 'হ্লাদিনীর সার— প্রেম"—অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতিই 'প্রেম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে প্রেম বলে। "প্রেমসার—ভাব" অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তম অবস্থাকে 'ভাব' বলা হয়। "ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব' " উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ—এই স্তরগুলি পার হইয়া 'ভাবে' পরিণত হয়। এই ভাবের গাঢ়তম পরিণতিকে 'মহাভাব' বলা হয়। অর্থাৎ প্রেমবিকাশের উচ্চতম স্তরের নাম 'মহাভাব'। এই মহাভাবই যাঁহার স্বরূপ, তিনিই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা। প্রেম = প্রিয় + ইমন্—প্রিয়ের ভাব অর্থাৎ প্রিয়তা। সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'ভালবাসা' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে ভালবাসায় প্রিয়ের সুখসাধন ভিন্ন অন্য কোন কামনা থাকে, তাহাকে 'প্রেম বলা যায় না।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়ভোগের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-

সুখ বিধান করাকে 'কাম' বলা হয়। ''আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।'' যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ-কামনার লেশমাত্র নাই, একমাত্র প্রিয়ের সুখ-কামনাই অভিপ্রেত, তাহাকেই বলে 'প্রেম'। প্রেমিক ভক্ত সেইরূপভাবে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করেন। ''কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম''—ইহাকেই 'প্রেম' আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের প্রেম এইরূপই। তাঁহাদের প্রেম ''বিশুদ্ধ নির্ম্মল—অধিরূঢ় * ভাব''—অর্থাৎ স্বসুখ কামনারূপ মলিনতা-শূন্য।

'কাম' ও 'প্রেমে' অনেক প্রভেদ।

হ্লাদিনীর সার—'প্রেম'। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরই একটী বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিভুবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সাধনে যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেরই সুখ সাধিত হয়। ''তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং। প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।'' সেজন্য এই সুখ-বিধান অত্যন্ত ব্যাপক, উদার ও সহনীয়। 'কাম'—প্রাকৃত মনের একটী বৃত্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি। নিজের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করাই উহার উদ্দেশ্য—''আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।'' সুতরাং উহা সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও নিন্দনীয়।

---

*'অধিরূঢ়'— প্রেম যখন বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষ সীমায় উপস্থিত হয় যখন সেই অবস্থায় সাত্ত্বিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হয়—অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন অসহ্য বোধ হয়, চিত্ত বিলোড়িত হইয়া উঠে, মিলনে সুদীর্ঘসময়কে ক্ষণমাত্র অল্পপরিমিত এবং বিরহের ক্ষণকালকে সুদীর্ঘসময় বলিয়া মনে হয়, আনন্দের স্ফূর্ত্তিতে বিরহের আশঙ্কায় 'স্বেদ', 'কম্প' প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকে 'রূঢ়' ভাব এবং এই রূঢ় ভাব যখন অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে, তখন তাহাকে 'অধিরূঢ়' ভাব বলা হয়। সাধারণ গোপীদের প্রেমের স্বরূপ এই। আর গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমের উৎকর্ষ যে কত বেশী, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ"ই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। 'রাগ' এর উৎকর্ষই 'অনুরাগ'। 'রাগ' বলিতে কি বুঝায়? 'দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে' (উঃ নীঃ মঃ)— অর্থাৎ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সেখানে চিত্তে অত্যধিক দুঃখ পাইতে থাকিলেও প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু ঐ দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয়। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, সদাচার ত্যাগ ও আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভর্ৎসনে অশেষ দুঃখ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং ঐসকল দুঃখ বরণের ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করায় ঐসকল দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেন। "না গণি আপনদুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ— মোর সুখবর্য্য।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০। ৫২) আবার এই রাগের উৎকর্ষ হইলে তাহাকে 'অনুরাগ' বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যাৎ নবং নবং প্রিয়ং। রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।।" (উঃ নীঃ) —প্রিয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও যখন উহা প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়— যেন পূর্ব্বে আর এরূপভাবে আস্বাদিত হয় নাই, তখন সেই রাগকে 'অনুরাগ' বলা হয়। রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা আস্বাদন করিয়াও ব্রজগোপীদিগের সেবার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় নাই। তাঁহাদের উৎকণ্ঠা দেখিলে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি নিত্য নব নবায়মান হইয়া উঠে— যাহা তাঁহারা আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এই অনুরাগ 'দৃঢ়'—অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ সাধন ভিন্ন অন্য কোনরূপ অভিলাষ তাহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও উহা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সামাজিক লোকাচারাদির অপালন বা আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভর্ৎসনজনিত দুঃখে ঐ সেবার উৎকণ্ঠাকে তরল করিতে পারে নাই।

কাম ও প্রেমের এই প্রভেদটী বুঝাইতে সূর্য্য ও অন্ধকারের দৃষ্টান্ত

দেওয়া হইয়াছে—"কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"—সূর্য্য ও অন্ধকার যেরূপ পরস্পর বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রূপ বিরোধী; গাঢ় অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নিজের অতি নিকটবর্ত্তী কোন বস্তুকে দেখিতে পায় না, অন্যপক্ষে সমুজ্জ্বল সূর্য্যের উদয়ে গাঢ়তম অন্ধকার তখনই দূরীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ যে চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়, তাহাতে কাম থাকিতে পারে না, প্রেমের আবির্ভাবেই কাম দূরীভূত হয়। গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম থাকায় উহাতে কামের স্থান নাই।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, গোপীদিগের মধ্যে যদি কাম না থাকিবে তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য এরূপ উৎকণ্ঠিতা হয়েন কেন?—তাহার উত্তর—"কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ"—অর্থাৎ কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গাদিদ্বারা সম্বন্ধ। ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক "যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং * * (ভাঃ ১০।৩১।১৯)। শারদীয়া রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিবার কালে বনভূমিতে কণ্টক এবং অতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি বিস্তৃত দেখিয়া উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সুকোমল চরণে অত্যন্ত বেদনা পাইতেছেন এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ শ্লোকানুরূপ কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে সুকোমল চরণ তাঁহাদের অঙ্গে স্থাপন করিতেও তাঁহাদের আশঙ্কা যে, তাঁহাদের কর্কশ অঙ্গের স্পর্শে ঐ চরণে ব্যথা পাইবেন অথচ উহা তাঁহাদের অঙ্গে স্থাপন করেন শুধু কৃষ্ণ তাহাতে সুখ পান এজন্য। সুতরাং তাঁহাদের অঙ্গে কৃষ্ণের চরণ স্থাপনেও তাঁহাদের স্বসুখ কামনার গন্ধমাত্র নাই পরন্তু উহা একমাত্র কৃষ্ণসুখের জন্য। স্বসুখবাসনা কিছু থাকিলে কৃষ্ণের সুকোমল চরণে বেদনার আশঙ্কা তাঁহারা করিতেন না।

গোপীদিগের প্রেমে যে কোন কামগন্ধ নাই, তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ

বাক্যদ্বারাও প্রমাণিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহাকে যে যেরূপভাবে ভজন করে, তিনি তাহার বাসনানুযায়ী তদ্রূপ ফল দিবেন— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গী ৪। ১১); কিন্তু ব্রজগোপীদিগের কোন বাসনাই নাই, সেজন্য তিনি তাঁহাদের অভীষ্ট দান করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ, তাহা পূর্ণ করায় শ্রীকৃষ্ণেরই সব পাওয়া হইল, গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না। সেজন্য তিনি গোপীদের সেবানুরূপ সেবা করিতে অসমর্থ— "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং" ইত্যাদি (ভাঃ ১০। ৩২। ২২)—অর্থাৎ হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, উহা নিরবদ্য (অনিন্দনীয়), এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য আমার সুখসাধন। এজন্য তোমরা, কুলবধূদের পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব, সেই গৃহশৃঙ্খল (গৃহসম্বন্ধী সর্ব্বপ্রকার বন্ধন— লোকমর্য্যাদা, ধর্ম্মমর্য্যাদা আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার ইত্যাদি) সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া আমার সেবা করিয়াছ। সুদীর্ঘকাল আয়ুঃ প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের ঐসকল সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি তোমাদের নিকট ঋণী রহিলাম।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, গোপীদের যদি নিজ সুখ দুঃখের প্রতি কোন অনুসন্ধান না থাকে, তবে কেন তাঁহারা যত্নের সহিত নিজ নিজ দেহের মার্জ্জন ও বেশভূষাদি করিতেন? তদুত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"সেহো ত কৃষ্ণের লাগি"—অর্থাৎ ঐসকল অঙ্গমার্জ্জন, বেশভূষাদি শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই করিতেন, নিজেদের তৃপ্তির জন্য নহে। তাঁহারা মনে করিতেন যে, তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত—তাঁহারই সম্ভোগের জন্য। সুতরাং সেই দেহের সৌন্দর্য্য বিধান করিলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দ বর্দ্ধন করা হইবে।

কেহ বা প্রশ্ন করিতে পারেন— গোপীদের যে কোন সুখবাসনা নাই, তাহাই বা কি কিরূপে বুঝা যায়?—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া তাঁহারা

নিজেরা সুখ পাইবেন এই উদ্দেশ্যেও ত তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার কারণ হইতে পারে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-বাসনার প্রবর্ত্তক কৃষ্ণকে সুখদান-বাসনা নহে—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া নিজেরা সুখ পাইবেন এই বাসনা। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ সুখের জন্য তাঁহাদের কোন বাসনা নাই, কিন্তু 'গোপীপ্রেমের এক অদ্ভুত স্বভাবই' এই যে, সুখলাভের বাসনা মূলে না থাকিলেও প্রেমের সহিত কৃষ্ণসেবা করিলে ঐ সেবার বস্তুগত ধর্ম্মবশতঃই আপনা আপনি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ দান করে। এই আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত্ত—নিজেদের সুখবাসনা-চরিতার্থ নহে—"সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি-গুণ।" ভক্তের সুখবাঞ্ছা না থাকিতে পারে, কিন্তুভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের সেবায় সুখী হইয়া তাঁহারই প্রসাদীসুখে ভক্তকে সুখসাগরে নিমজ্জিত করেন। সুখ বাঞ্ছা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, শ্রীভগবানের প্রদত্ত প্রসাদী সুখ তাহা-অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক। গোপীদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীরা তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ পান। গোপীদের সুখলাভের বাসনা নাই অথচ গোপীগণ কোটিগুণ সুখ আস্বাদন করেন—এই পরস্পর বিরোধী উক্তির সমাধান এই যে, "গোপীকার সুখকৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান"— গোপীদের সুখের স্বতন্ত্র কোন গতি বা পরিণতি নাই, তাঁহাদের সুখ কৃষ্ণসুখেই পরিণতি লাভ করে। [শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই কৃষ্ণসুখের পুষ্টিসাধন-জন্য গোপীদের চিত্তে কৃষ্ণদর্শনজনিত এই আনন্দ জাগাইয়া দেন, তাহাতে গোপীদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যাহা দেখিয়া কৃষ্ণেরই সুখ বর্দ্ধিত হয়। প্রেমবতী গোপীদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্লতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যাহার ফলে তাঁহার মাধুর্য্য এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহার তুলনা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রফুল্লতা দর্শনে গোপীগণও নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। আনন্দে তাঁহারাও চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

গোপীদের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে গোপীদের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে—"এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি।।" —অর্থাৎ যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হয়, কেহ পরাজয় স্বীকার করেন না।

গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উহা অন্যভাবেও দেখাইতেছেন "প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ"—যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রীতি করা হয় তিনি প্রীতির 'বিষয়' এবং যাঁহাতে ঐ প্রীতি অবস্থিত অর্থাৎ যিনি প্রীতি করেন, তিনি প্রীতির 'আশ্রয়'। যাঁহার প্রতি প্রীতি করা হয়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই যিনি প্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ জন্মে—তাঁহার কোন ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না, উহাপ্রীতিরই ধর্ম্ম।

কৃষ্ণের সুখবিধানে ভক্ত যে নিজের আনন্দও চান না বরং ভক্তের মনে আনন্দাধিক্যহেতু যদি কৃষ্ণসেবায় বিঘ্ন জন্মে, তবে ভক্ত ঐ আনন্দও চাহেন না বরং কৃষ্ণসেবা-বিঘ্নকারক নিজের ঐ আনন্দের উচ্ছ্বাস-প্রতি তাহার ক্রোধ জন্মে।

"নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।"

(চৈঃ চঃ আদি ৪। ২০১)

তাহার প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক একদিন শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় কৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার চিত্তে অত্যধিক আনন্দের উচ্ছ্বাস হওয়ায় দেহে সাত্ত্বিকভাবের (স্তম্ভ) উদয় হওয়ায় হস্তে জড়তা উপস্থিত হইলে তাঁহার চামর-ব্যজনের বিঘ্ন উৎপাদন করে দেখিয়া নিজ প্রেমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতে করিতে তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া পড়িল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ

ভালভাবে দর্শন করিতে পারিতেছেন না বোধে সেই আনন্দকেও অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন। এখানে সেবানন্দ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য বুঝাইতেছে। কৃষ্ণসেবাই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু গোপীগণ নহেন ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণও কৃষ্ণসেবা না পাইলে সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য এবং সারূপ্য মুক্তিও চাহেন না।

প্রেমসেবায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 'বিষয়' এবং গোপীগণ 'আশ্রয়'। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিলে গোপীদিগের আপনা আপনি আনন্দ জন্মে। এই আশ্রয়জাতীয় আনন্দের সহিত গোপীদের স্বসুখ বাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার আরও কারণ এই "নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি"—অর্থাৎ প্রেমের ধর্ম্মই এই যে যেস্থানে উহা নিরুপাধি হয় অর্থাৎ কামনাগন্ধহীন হয় সেস্থানে বিষয়ের আনন্দে আশ্রয়ের আনন্দ। [উহাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে বিষয়ানন্দে আশ্রয়ের আনন্দ উহা শুধু গোপীদের সম্বন্ধে নহে; বিষয় কৃষ্ণের আনন্দে ভক্তমাত্রেরই আনন্দ। দাস্যের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদির, সখ্যের আশ্রয় মধুমঙ্গলাদির, বাৎসল্যের আশ্রয় নন্দ-যশোদাদিরও আনন্দ হয়। নিরুপাধি বা নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ।]

গোপীদের কৃষ্ণসেবায় নিজেদের কোন ফলানুসন্ধান নাই, তাহাই প্রমাণিত হইল। ভাগবতে যে নির্গুণা ভক্তিলক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহাতেও ঐ একই কথা। "মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ" ইত্যাদি (ভাঃ ৩। ২৯। ১১-১২) —পুরুষোত্তম ভগবানে ভক্তের যে মনের গতি হইবে, উহা সমুদ্রের দিকে ধাবমানা গঙ্গাধারার ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসুখচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা-দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত নহে, উহা অহৈতুকী— কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ নিজের নিমিত্ত কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা উহাতে থাকিবে না, উহা অব্যবহিতা—কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির ব্যবধান থাকিবে না—আরোপসিদ্ধা না হইয়া সাক্ষাৎ ভক্তিরূপা হইবে এবং ঐ ভক্তির ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণাদি হইতে উন্মেষ হইবে, অন্যকারণশূন্য হওয়া চাই, কারণ ভক্তি হইতেই ভক্তির

জন্ম। যাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃত (ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির ঐশ্বর্য্য, সমগ্র পৃথিবীতে বা পাতালের ঐশ্বর্য্যাদি) কোনরূপ সুখ-সম্পদ্ বা অপ্রাকৃত ভগবল্লোকে বাস বা ভগবত্তুল্য ঐশ্বর্য্যাদিও ভগবৎসেবার বিনিময়ে চাহেন না।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, শুধু গোপীদিগের কেন, শুদ্ধভক্তমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন নিজেদের কোন ফলানুসন্ধান নাই। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনে, স্বপ্রয়োজনবোধের কোন কথাই এখানে নাই—"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২। ১২৩)। এই প্রসঙ্গে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, শুদ্ধভক্তগণের ভুক্তি-মুক্তিরূপ প্রয়োজনবোধ না থকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা প্রেমকেই প্রয়োজন কেন মনে করেন এবং এই প্রেমোদয়ের জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই বা কেন অনুষ্ঠান করেন—উহাতে কি মনে হয় না যে, তাঁহাদেরও স্বপ্রয়োজনরূপ বোধ আছে? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, তাঁহাদের যে প্রেমলাভের প্রয়োজনবোধ, উহাও শ্রীভগবানের জন্যই—নিজ প্রয়োজনে নহে। শ্রীভগবানের একমাত্র প্রিয় বস্তু প্রেম, তিনি পূর্ণ ও আত্মকাম হইয়াও প্রেমলোলুপ এবং প্রেমেরই তিনি বশীভূত— "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"। তিনি বলিতেছেন "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" (গী ৯। ২৯)। তাই সর্ব্বভূতে নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয়, ভক্তকে তিনি নিজহৃদয়ে ধারণ করেন এবং ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। করুণাময় শ্রীভগবানের এই প্রেমলোলুপতা আছে বলিয়াই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পরম আশার কথা এই যে, বিশুদ্ধ ভালবাসা বা ভক্তির মাধ্যমে কোন একদিন তাঁহার চরণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কুসুমে মধুর সঞ্চার হয়—উহা কুসুমের প্রয়োজনে নহে, মধুলোভী ভ্রমরেরই প্রয়োজন। সেইরূপ ভক্তের হৃদয়ে যে প্রেমোদয়, উহা প্রেমলোলুপ শ্রীভগবানেরই প্রয়োজনে, ভক্তের প্রয়োজন নহে। এজন্য ভক্ত প্রেমকে প্রয়োজনবোধ করেন।

ভক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করেন—শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধক প্রেমোদয়ের জন্যই, নিজ সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র উহাতে নাই। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও ঐ তাৎপর্য্যই দেখা যায়—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

(ভাঃ ৭। ৫। ২৩-২৪)

ইহাতেও বলা হইয়াছে যে শ্রবণাদি নব লক্ষণা ভক্তি প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎভাবে অর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ অন্য কামনাশূন্য হইয়া একমনে তাঁহার প্রীতিসাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়া তৎপর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাক্ষাৎভাবে অর্পিত হওয়ার তাৎপর্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন—"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্পোতেতি"—অর্থাৎ অগ্রে ভগবানে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান—এইরূপ হইলেই শুদ্ধভক্তি হইবে। সুকৃতীদিগের স্বপ্রয়োজনে প্রথমে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পরে উহা ভগবানে অর্পণ এরূপ নহে।

এ পর্য্যন্ত গোপীগণের প্রেমের বৈশিষ্ট্য বলা হইল। সেই গোপীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা—"কৃষ্ণের বল্লভা রাধা, কৃষ্ণপ্রাণধন", তিনি 'কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি'। কৃষ্ণকে কে আনন্দ দিতে পারে? তিনি 'পূর্ণানন্দ, পূর্ণরস'—অথচ শ্রীরাধা 'গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী'। তাই শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন তাঁহা অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতে অধিক গুণ আছে। তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট্ (স্বীয় শক্তিসহায়ে বিরাজিত)। সেজন্য তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তু তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে না। এজন্য শ্রীরাধার রূপরসাদি মাধুর্য্য তাঁহার রূপরসাদি মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, রসনা, কর্ণ,

ত্বক ও নাসিকাকে আনন্দ দান করে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেছেন যে শ্রীরাধার রূপ-রসাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি অপেক্ষা অধিকতর আনন্দাদায়ক। **রূপ-মাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার রূপমাধুর্য্যে ত্রিভুবন আনন্দিত, উহা কোটি কন্দর্পকে মুগ্ধ করে, এতাদৃশ আমারও শ্রীরাধার রূপদর্শনে তৃপ্তিলাভ করে'। **শব্দমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধিকার কণ্ঠস্বরে আমার কর্ণ আকৃষ্ট হয়।' **গন্ধমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার অঙ্গগন্ধে জগতের সমস্ত বস্তু সুগন্ধ, কিন্তু শ্রীরাধিকার অঙ্গগন্ধ আমার প্রাণ হরণ করে।' **রসমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার অধররসে সমস্ত মুগ্ধ। [ভক্তগণের নিবেদিত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিলে ঐসকল দ্রব্যে তাঁহার অধররস সঞ্চারিত হয়, সেই ভুক্তাবশেষ ভক্তগণ মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করেন] কিন্তু শ্রীরাধার অধররসে (চুম্বনাদিতে) আমার শরীর অবশ হয়।' **স্পর্শমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার স্পর্শে কোটিচন্দ্র সুশীতল হয়, কিন্তু শ্রীরাধার স্পর্শের স্নিগ্ধতায় আমি অপার আনন্দ লাভ করি।' এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে রূপরসাদি-মাধুর্য্যে তাঁহা অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু **তটস্থ-বিচারে** (অর্থাৎ কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া) উহার বিপরীত ভাব দেখা যায়—আমার রূপরসাদির মাধুর্য্যে শ্রীরাধার চক্ষুকর্ণাদি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে। **শব্দসুখ**—'আমার বেণুগীতেই শ্রীরাধা অচেতন হইয়া পড়েন।'' **স্পর্শসুখ**—'তমালবৃক্ষের সহিত আমার বর্ণসাদৃশ্য থাকায় শ্রীরাধা তমালবৃক্ষকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া মনে করিতেছেন যে আমার স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন।' **গন্ধসুখ**—'সাক্ষাৎভাবে আমার অঙ্গগন্ধ না পাইলেও দূর হইতে অনুকূল বাতাসে যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে তবে সেই বাতাসের গন্ধে প্রেমোন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য সেই গন্ধ লক্ষ্য করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসেন।' **রসসুখ**—

সাক্ষাৎভাবে চুম্বনাদি প্রাপ্তির দ্বারা আমার অধরসুধা আস্বাদন দূরের কথা, আমার চর্ব্বিত তাম্বুলাদি মাত্র আস্বাদনেই শ্রীরাধা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে এমন কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে যাহা শ্রীরাধিকাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে পারে।

এই সকল ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। সেই রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও আস্বাদন করিতে পারেন না; অথচ নিজে অসমর্থ হইলেও শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তাহা আস্বাদিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার লোভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীরাধার আস্বাদিত এই সুখটি কিরূপ "সৌখ্যং মদনুভবতঃ কীদৃশং বা" ইহা উপলব্ধি করার লালসাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ। শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার না করিলে উহা আস্বাদন করা অসম্ভব, তাই রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরসুন্দররূপে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

পরোক্ষপ্রিয় শ্রীভগবান্‌কে শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ না করিয়া অধিকাংশ স্থলে পরোক্ষতার আবরণে প্রচ্ছন্নলক্ষণে যেমন ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তভাবে প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরহরিকেও বেদাদি শাস্ত্র অধিকাংশ স্থলে ছন্নলক্ষণেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যক্ত করার কারণ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। **শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি—** গৌরসুন্দর যে বর্ত্তমান কলিতে "ছন্ন অবতার"—শৃঙ্গাররসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহরূপে বিশেষ কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, উহা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধ ৯ম অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর বধান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের ভয়ঙ্কর কোপাবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে

শ্রীপ্রহ্লাদ যখন ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহার কোপশান্তির জন্য নৃসিংহদেবের পাদপদ্মে পতিত হইলেন, তখন নৃসিংহদেবের বরাভয়প্রদ করকমল প্রহ্লাদের শিরোদেশে অর্পিত হইলেই প্রহ্লাদের নৈসর্গিক ভগবজ্জ্ঞান প্রকাশিত হইল এবং তিনি যে স্তব করিতে লাগিলেন উহার একটি অংশ "ছন্ন কলৌ যদ্ভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" অর্থাৎ যেহেতু কলিযুগে আপনি প্রচ্ছন্নরূপে থাকিবেন সেজন্য আপনি 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ। এই উক্তিতে ছন্নাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেই প্রচ্ছন্নাবতার গৌরসুন্দরকে শ্রুতিও প্রচ্ছন্নভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন।

এখন আমরা শ্রুতির উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গমুনির উক্তি, শ্রীকরভাজনের উক্তিসমূহ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রুতির উক্তি—

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।" (মুণ্ডক)

উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের একটী রুক্মবর্ণ (স্বর্ণকান্তি) স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া তটস্থ লক্ষণে (অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা পরিচয়ে) তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকটির অর্থ এইরূপ হইতে পারে—বিদ্বান্ (ভক্তিমান্) সাধক যে সময় সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি সেই রুক্মবর্ণ (হেমকান্তি) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাহার পুণ্যপাপজনিত সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া যায়। তখন তিনি নিরঞ্জন (মায়ালেপশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বমায়িক উপাধিবর্জ্জিত) হইয়া (স্বরূপভূত চিদ্রূপে) বিভু চিৎ পরব্রহ্মের পরম সাম্য (চিদ্রূপে সমতা) লাভ করেন। এখানে বিদ্বান্ শব্দের অর্থ 'ভক্তিমান্'। প্রভু কহে,—

"কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার? রায় কহে — কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮। ২৪৪)। সুতরাং যিনি কৃষ্ণভক্তিমান্ তিনিই একমাত্র রুক্মবর্ণ পরম পুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। অথবা রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শনের মুখ্য ফলরূপে দ্রষ্টা 'বিদ্বান' বা প্রেমভক্তিমান্ হইতে পারেন।

ঐ শ্রুত্যুক্ত প্রত্যেক শব্দটীর মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হয় এবং উহাতে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত স্বর্ণকান্তি শ্রীগৌরসুন্দরই নির্দ্দেশ্য বস্তু বুঝা যায়।

'ব্রহ্মযোনি'—ব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল, কারণ বা আশ্রয়। 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ, ব্রহ্মা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম— যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণই ঐ সকলের একমাত্র কারণ—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীতা), সুতরাং উহার দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবর্ণ 'নব নীরদ শ্যাম'—নবমেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে 'রুক্মবর্ণ' (স্বর্ণবর্ণ) বলা হইয়াছে। উহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিদ্বারা আবৃত হইয়া ছন্নরূপে হেমকান্তি গৌরহরিরূপে প্রকটিত হন, সেই শ্রীগৌর-স্বরূপকেই 'রুক্মবর্ণ' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতির ঐ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'কর্ত্তারমীশম্'—অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তা প্রভু। উহা স্বয়ং ভগবান্‌কেই নির্দ্দেশ করে। 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' (শ্বেতা)।

'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ'—অর্থাৎ সেই রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করিলে কৃষ্ণভক্তিমান্ দ্রষ্টার পুণ্যপাপজনিত সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া যায় এবং তিনি নিরঞ্জন (মায়ালেপশূন্য সর্ব্বমায়িক উপাধিবর্জ্জিত) হইয়া যান। মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি রহিয়াছে, — "শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন।।" (চৈঃ

চঃ আদি ৩। ৬৩) সুতরাং তাঁহার শ্রীমুখ দর্শনের ফলে আনুষঙ্গিক বা গৌণফলরূপে দ্রষ্টা পাপশূন্য ও মায়ালেপমুক্ত হন এবং মুখ্যফলরূপে প্রেমমহাধন প্রাপ্ত (বিদ্বান্) হন।

"পরমং সাম্যং উপৈতি"—অর্থাৎ অণুচিৎ জীব যখন দেহাত্মাভিমান (মায়ালেপ) বর্জ্জিত হয় তখন চিদনুশীলন বৃত্তিতে বিভুচিৎ পরব্রহ্মের সহিত সমতা (সজাতীয়তা) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নিত্যদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অথবা পরমপুরুষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার নিজ আস্বাদিত ও প্রচারিত নাম-প্রেম আস্বাদনের অধিকারী হয়, সেই অর্থে তাঁহার সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়। পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত অন্যের অদেয় (অনর্পিতচরীং চিরাৎ) নাম-প্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া অপরকেও আস্বাদনের অধিকারী করিয়াছিলেন 'আপন আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্ত্তন।। সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম মালা গাঁথি পরাইলা সংসারে।।' (চৈঃ চঃ আদি ৪। ৩৯-৪০)।

গর্গাচার্য্যের উক্তি—এখন আমরা গর্গোক্তির তাৎপর্য্য আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে গর্গমুনি নন্দমহারাজের নিকট যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।"

(ভাঃ ১০। ৮। ১৩)

অর্থাৎ হে ব্রজরাজ, যুগানুরূপ মূর্ত্তিধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, এখন ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে গর্গমুনি 'কৃষ্ণ' নামটী সঙ্কেতে নন্দমহারাজের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাহার কারণ স্পষ্টভাবে বলিলে উহা কংসের কর্ণগোচর

হইবে এবং তাহাতে তাহার উৎপাত বৃদ্ধি হইবে। তদ্ভিন্ন গূঢ়তত্ত্বটি প্রকাশ করিলে উহা নন্দমহারাজের ভাবের অনুকূল হয় না। নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রবল—শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্, এরূপ অনুভূতি তাঁহার নাই। সেজন্য গর্গাচার্য্য কৌশল পূর্ব্বক দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকটী বলিলেন।

শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের সত্য ও ত্রেতাযুগে যে যুগাবতারের শুক্ল ও রক্ত বর্ণ উহা স্পষ্টভাবে বলা হইল, উহাতে কোন প্রচ্ছন্ন রহস্য নাই। দ্বাপরে ও কলিযুগের বর্ণ সম্বন্ধে রহস্য রহিয়াছে। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন-জন্য বিভিন্ন যুগের যুগাবতারগণের বর্ণ ও নাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে—

"কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু।।"

(ভাঃ ১১।৫।২১)

অর্থাৎ সত্যযুগে যুগাবতার শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হন।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।

(ভাঃ ১১।৫।২৪)

অর্থাৎ ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশবিশিষ্ট, শরীর বেদময় এবং স্রুক্ স্রুবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি।

এখন দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ণরহস্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

লঘুভাগবতামৃত বলেন—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লং সত্যযুগে হরিঃ। রক্তশ্যাম ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ।।' ইহাতে বলা হইতেছে যে, দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ 'শ্যাম' এবং কলির

যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ 'কৃষ্ণ'। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"—অর্থাৎ দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ 'শুকপত্রাভ' এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ 'শ্যাম'। উহাতে আমরা পাইলাম—দ্বাপরের যুগাবতারের নাম 'শ্যাম' এবং বর্ণ 'শ্যাম' (লঘু-ভাগবত-মতে) অথবা 'শুকপত্রাভ' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-মতে)—একার্থবাচক বলিতে পারা যায়। কলির যুগাবতারের নাম 'কৃষ্ণ' বা 'শ্যাম' এবং বর্ণও 'কৃষ্ণ' (লঘুভাগবত মতে) অথবা 'শ্যাম' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে)—একার্থবাচক বলা যাইতে পারে।

সাধারণ দ্বাপরযুগে যুগাবতারের বর্ণ শ্যাম কিংবা শুকপত্রাভ। গর্গোক্ত শ্লোকে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে বর্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'অধুনা কৃষ্ণতাং গতঃ'—উহাতে নন্দমহারাজ বুঝিলেন—তাঁহার পুত্র এই জন্মে কৃষ্ণবর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু গর্গমুনির ঐ উক্তির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে—পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার 'কৃষ্ণতা' অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণাদি লইয়া পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবর্ণ নীরদশ্যাম-কান্তিই (মেঘাভং) বুঝাইতেছে। আবার স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন যুগাবতারাদি সকলেই তাঁহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন।—"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।।" (চৈঃ চঃ আদি ৪। ১০)। সেজন্য সাধারণ দ্বাপরের যে বর্ণ 'শুকপত্রাভ শ্যাম' তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। দ্বাপরের বর্ণরহস্যের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইল।

এখন গর্গোক্ত শ্লোকের পীতবর্ণের কথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের বর্ণসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে বাকী থাকে শুধু কলিযুগের বর্ণের কথা। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং"— শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ কলিযুগাবতারের 'কৃষ্ণ' নাম ও 'কৃষ্ণ' বর্ণ। উহাতে পীতবর্ণের কোন কথা নাই কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রপ্রমাণও পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার

প্রচ্ছন্ন তত্ত্বটী এই—সাধারণ কলিযুগাবতারের বর্ণ 'শ্যাম' ইহা সত্য, কিন্তু গর্গাচার্য্য যে সময়ে তাঁহার উক্তি করিয়াছেন, উহা অসাধারণ দ্বাপর যুগ অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপর—যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে (ব্রহ্মার এক কল্পে একবার মাত্র) অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ঐ অসাধারণ দ্বাপরের ঠিক পরবর্ত্তী কলিযুগে সেই স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার স্বমাধুর্য্য পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিবার জন্য অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহরূপে এবং উহার আনুষঙ্গিক ভাবে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবার জন্য রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হেমকান্তি শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব, উহারই বর্ণ পীত। গর্গোক্ত শ্লোকে যে পীতবর্ণের উল্লেখ আছে, উহা ঐ অসাধারণ কলিযুগে তাঁহার আবির্ভাবের অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভাবেরই বর্ণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান্ যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার মধ্যে যুগাবতারাদি অন্তর্ভূক্ত থাকেন। সুতরাং যিনি সাধারণ কলিযুগের যুগাবতার, তিনি গৌরসুন্দররূপে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, এজন্য সাধারণ কলিযুগের যে বর্ণ ও নাম—শ্যামবর্ণ ও শ্যামনাম সেই তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে সময় গর্গাচার্য্য তাঁহার ঐ শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখন তো কলিযুগ আসে নাই অথচ তখন পীতবর্ণ বলা হয় কিরূপে? বিশেষতঃ ঐ শ্লোকে 'হইবেন' ইহা না বলিয়া 'আসন্' অর্থাৎ 'হইয়াছিলেন' এই অতীত কালের কথা বলা হইয়াছে। উহার উত্তর এই যে, বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ অবতার 'ছন্ন' বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে অতীত কাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অতীতকাল ব্যবহার করার আরও একটী রহস্য উহাতে রহিয়াছে যে—ব্রহ্মার পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ কোটি কোটি যুগ পূর্ব্বেও স্বয়ং ভগবান্ যখন এক অসাধারণ দ্বাপরে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তৎপরবর্ত্তী অসাধারণ কলিযুগে বর্ত্তমান কলিযুগের ন্যায় তিনিই স্বর্ণকান্তি গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই অর্থেও 'আসন্' অতীতকাল ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়। শ্রীজীবপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন—"পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া।" একই কল্পমধ্যে একটীমাত্র বিশেষ কলিযুগে, তাহাও আবার ছন্নলক্ষণে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব, এজন্য প্রহ্লাদোক্ত "ছন্ন কলৌ" শ্লোকাংশে স্বয়ং ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। অন্যত্র 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্' এই অন্য একটী বিশেষণ দ্বারাও বুঝাইতেছে যে, সাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণাদি যুগাবতারের কেহই 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্' অর্থাৎ স্বয়ংরূপ নহেন। শুধু এই অসাধারণ কলিযুগেই তিনি 'ছন্ন' এবং 'প্রত্যক্ষরূপধৃক্'। অন্য সাধারণ কলিযুগের অবতারগণ সাধারণতঃ শ্রীভগবানের 'আবেশাবতার'।

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, শ্রীভগবান্ যে কলিতে পীতবর্ণে আবির্ভূত হন, উহা সাধারণ যুগাবতার নহে, উহা গৌরসুন্দরের নিজস্বরূপ। পীতবর্ণ কোন যুগাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নহে।

'শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ'— শ্লোকাংশের এই 'তথা' শব্দটী অবলম্বন করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় অন্য একপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। সে অর্থেও মহাপ্রভু গৌরসুন্দর যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিতেছেন— "যত্তদোর্নিত্য সম্বন্ধাৎ * *"। উহার মর্ম্ম এইরূপ—'যৎ' এবং 'তৎ' এর নিত্য সম্বন্ধ থাকা হেতু যেখানেই 'যৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানেই উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'তৎ' শব্দে আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ যেখানে 'যথা' বা 'তথা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে উহা যথাক্রমে 'তথা' এবং 'যথা' শব্দটীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত বুঝিতে হয়। একটী উক্ত থাকিলে অন্যটী উহ্য আছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং গর্গোক্ত শ্লোকাংশের

অন্বয় সম্বন্ধে এইরূপ করা যায় "যথা ইদানীং (দ্বাপরান্তে) কৃষ্ণতাং গতঃ তথা (তেনৈব প্রকারেণ ইদানী কলিযুগাদি-ভাগে) পীতঃ"। এখানে ইদানীং শব্দটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ('কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য') গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল দ্বাপরের শেষে যখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া 'ইদানীং' শব্দদ্বারা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথম ভাগকে বুঝিতে হইবে। তখন শ্লোকাংশের অর্থ এইরূপ হইবে—"হে ব্রজরাজ, তোমার এই পুত্র এখন যেমন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তেমনই এখনই (অল্প-কিছুকাল পরেই কলির প্রারম্ভেই) তিনি পীততা প্রাপ্ত হইবেন।"

শ্রীকরভাজন ঋষির উক্তি

ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ যুগে কিরূপ বর্ণ ও নামে অবতীর্ণ হন এবং কোন্ বিধি অনুসারে এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হয়েন, নিমি মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন ঋষি প্রথমতঃ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যাদি বলিবার পর বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিতে শ্রীভগবানের অবতরণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

(ভাঃ ১১। ৫। ৩২)

—অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, কান্তিতে অকৃষ্ণ (অথবা কৃষ্ণ), অঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্যদ-সহ অবতীর্ণ শ্রীভগবান্‌কে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। এই শ্লোকটীতেও দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দের দ্বারা একরূপ অর্থে সাধারণ কলিযুগের কৃষ্ণনাম ও বর্ণবিশিষ্ট যুগাবতারের ইঙ্গিত করিয়া অপর প্রচ্ছন্ন অর্থে বিশেষ কলিযুগের অসাধারণ অবতার সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকেই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লোকটী আলোচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত 'ছন্নঃ কলৌ' (ভাঃ ৭। ৯। ৩৮) শ্লোকাংশে শ্রীভগবানের আচ্ছাদিত রূপটীর কথা অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহের স্বাভাবিক নিজস্ব রূপটী সাধারণতঃ প্রকাশিত হইবে না—বর্ত্তমান কলির অবতারের ছন্নত্বই একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যাঁহাতে নাই, তাঁহাকে এই কলির অবতার বলিয়া মনে করা যাইবে না—শ্রীপ্রহ্লাদের এই সতর্কবাণী মনে করিয়াই শ্রীকরভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং * *" শ্লোকটী আলোচনা করিতে হইবে।

গর্গাচার্য্যোক্ত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য" শ্লোকটীর সহিতও সামঞ্জস্য থাকা উচিত। গর্গোক্তিতে বিশেষ চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতার শুক্ল ও রক্তবর্ণ সাধারণ যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীকরভাজনোক্ত শ্লোকসমূহেও সত্য ও ত্রেতার যুগাবতারের কোন বিশেষত্ব বর্ণিত হয় নাই। গর্গোক্ত "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" উক্তিদ্বারা অসাধারণ দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথাই বুঝাইতেছে, এইরূপ কর-ভাজনোক্ত "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" (ভাঃ ১১। ৫। ২৭) এবং পরবর্ত্তী 'নমস্তে বাসুদেবায়' (ভাঃ ১১। ৫। ২৯) শ্লোকদ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। গর্গোক্ত শ্লোকের 'পীত' এই প্রচ্ছন্ন লক্ষণ দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ করভাজনোক্ত দ্ব্যর্থবোধক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং * *" শ্লোকে 'কৃষ্ণ' নাম ও বর্ণ-যুক্ত সাধারণ কলিযুগাবতারের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া বিশেষ ভাবে ছন্ন লক্ষণে একমাত্র ছন্নাবতারী গৌরহরিকেই নির্দ্দেশ করিয়া নিগূঢ়তত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকরভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং * *" দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকটিতে সাধারণ কলিযুগাবতার সম্বন্ধে অর্থ এইরূপ—'কৃষ্ণবর্ণং'—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ (সাধারণ কলিযুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ)। বর্ণ বলিতে বর্ণন অর্থাৎ আখ্যা বা নামও বুঝায়—তাহাতে অর্থ হইবে 'কৃষ্ণ' এই নাম

যাঁহার। 'ত্বিষাকৃষ্ণং'—সন্ধিবিহীন অর্থ ত্বিট্‌শব্দের তৃতীয়ার একবচন-ত্বিষা কৃষ্ণং। ত্বিট্ অর্থ কান্তি, সুতরাং কান্তিতে (দেহবর্ণে) যিনি কৃষ্ণ—যাঁহার (নাম) কৃষ্ণ, কান্তিও কৃষ্ণ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'—হস্ত পদাদিকে অঙ্গ এবং অঙ্গুলী আদিকে উপাঙ্গ বলা হয়। অস্ত্র—চক্রাদি, যাহাদ্বারা শ্রীভগবান্ অসুর সংহারাদি করেন—সুতরাং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-সহ যিনি অবতীর্ণ হন।

'সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ'—নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা লোকে যাঁহাকে আরাধনা করিয়া থাকে। এখানে সংকীর্ত্তন অর্থে—কীর্ত্তন—ভগবন্নামের উচ্চ কথন মাত্র।

'সুমেধসঃ'—সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ [ভাঃ ১২। ৩। ৪৪ শ্লোকে শ্রীশুক-দেব বলিয়াছেন—"যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ"—অর্থাৎ কলির যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান হইলেও সর্ব্বদোষনিধি সাধারণ কলিযুগের মনুষ্যগণ ভগবদ্বিমুখ ও ভগবন্নাম-গ্রহণে অনিচ্ছুক— "কলৌ ন রাজন্" (ভাঃ ১২। ৩। ৪৩), সুতরাং কলিযুগের মধ্যে অতি অল্পলোক যাঁহারা যুগধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারাই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি সম্পন্ন।]

শ্লোকটীর অপর নিগূঢ় অর্থে বর্ত্তমান অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রচ্ছন্নলক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছে। তখন শ্লোকোক্ত শব্দগুলির অর্থ এইরূপ হইবে—

'কৃষ্ণবর্ণং'—'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) আছে যাঁহাতে অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটীর মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ংভগবত্তা)-সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান।

অথবা—যিনি কৃষ্ণনাম বর্ণন করেন—যিনি কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিকে এবং উহাদের মাহাত্ম্যকে) খ্যাপন করেন।

অথবা কৃষ্ণনামে স্বকীয় পরমানন্দবিলাস-স্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সমস্ত লোককেই ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি।"—(শ্রীল প্রভুপাদ)

ত্বিষাঽকৃষ্ণং—যিনি কান্তিতে অর্থাৎ অঙ্গপ্রভায় 'অকৃষ্ণ' (পীত)। ['অকৃষ্ণ' অর্থে যাহা কৃষ্ণ বর্ণ নহে তাহাকে বুঝায়। গর্গোক্ত বচনে "তথা পীতঃ" (ভাঃ ১০।৮।১৩) এই শ্লোকাংশের দ্বারা এবং প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নঃ কলৌ যদ্ভবঃ" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) এই উক্তি দ্বারা জানা যায় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, তৎপরবর্ত্তী কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণে ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন, সুতরাং 'অকৃষ্ণ' অর্থে পীতবর্ণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "যথা পশ্যঃ পশ্যত * * শ্রুতিবাক্যেও যাঁহাকে রুক্মবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনিই 'অকৃষ্ণ' বা পীতবর্ণ। রুক্ম অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণকেই পীতবর্ণ বলা হয়।] সুতরাং ত্বিষাঽকৃষ্ণং বলিতে গৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'—'অঙ্গ' বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুদ্বয়, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহার 'উপাঙ্গ'। অবিদ্যাহরণকারী শ্রীহরিনাম যাঁহার 'অস্ত্র', শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, রায়-রামানন্দ, রূপ-সনাতনাদি যাঁহার 'পার্ষদ', সেই গৌরহরিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। [শ্রীভগবান্ সাধারণতঃ চক্রাদি অস্ত্র দ্বারা অসুর সংহারাদি করিয়া থাকেন এবং পার্ষদবর্গও ঐ কার্য্যে আনুকূল্য করেন। কিন্তু বর্ত্তমান কলির অবতার শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনরূপ অস্ত্র দ্বারা অসুরদিগের আসুর স্বভাব বিনষ্ট করেন।] এই পদ দ্বারা গৌরসুন্দরের ভগবত্তা প্রকাশ পাইতেছে।

এমন যে গৌরসুন্দর তাঁহাকে ভক্তগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন তদুত্তরে—

"সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ"—সঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ বহুলোক সম্মিলিত হইয়া যে কৃষ্ণনামগান সেই সঙ্কীর্ত্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্ত্তমান যাহাতে এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রধান পূজোপকরণের দ্বারা মহাপ্রভু সর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হয়েন।

"সুমেধসঃ"—সু (উত্তম) মেধা (বুদ্ধি) যাঁহাদের—যাঁহারা উত্তম-বুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনকারী গৌরসুন্দরের যজনই একমাত্র কৃত্য। কলিকালে সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অর্চ্চনাদি এমনকি স্মরণেরও সম্ভাবনা নাই। সেজন্য অন্যপ্রকার ভগবৎ-পূজা সুবুদ্ধিজনগণের অনুষ্ঠেয় নহে। কৃষ্ণ-নাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনমুখে যজন-দ্বারা অতি পাষণ্ডীও পরিত্রাণ লাভ করে। এজন্য যাঁহারা এইভাবে মহাপ্রভুর যজন করেন করভাজন ঋষি তাঁহাদিগকে সুমেধা বলিয়াছেন—'সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য।। সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার।। (চৈঃ চঃ আদি ৩। ৭৬-৭৭)। "এই সুমেধাগণই গর্গোক্ত "শুক্লো রক্তস্তথা-পীতঃ", প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নঃ কলৌ" এবং করভাজনোক্ত "কলাবপি তথা শৃণু * *" ইত্যাদি বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত শোভমানা বুদ্ধি-সম্পন্ন।" (বিশ্বনাথ)

উপরি উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং * *" শ্লোকটীতে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ কলিযুগ এবং অসাধারণ কলিযুগবিশেষ (যাহাতে পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হন)—উভয় যুগেরই লক্ষণ ও ধর্ম্ম করভাজন ঋষি বর্ণন করিয়াছেন। শ্লোকটী দ্ব্যর্থবোধক করিলেন কেন তাহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

করভাজনঋষি শ্রীমদ্ভাগবতে কলিযুগের লক্ষণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"কলৌ ন রাজন্ * * যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ" (ভাঃ ১২। ৩। ৪৩-৪৪), উহার মর্ম্মার্থ এই যে কলিযুগের মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণকর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় প্রায়শঃ বিরত থাকিবে এবং তাহারা প্রায়শঃ শ্রীনামগ্রহণে বিরত থাকিবে। উক্ত প্রকার দোষবহুল কলিযুগের আবার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে—

"কলের্দোষনিধে রাজন * *" (ভাঃ ১২।৩।৫১) অর্থাৎ সর্ব্বদোষযুক্ত কলিযুগের ইহাই একমাত্র মাহাত্ম্য যে মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত থাকেন। করভাজন ঋষি পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৫।৩৭ শ্লোকে বলিয়াছেন "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ * *।" উহার মর্ম্মার্থ এই যে সত্যাদিযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করেন এবং কলিযুগে অনেকেই নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন।

ইহাতে বুঝা যায়, যে কলিযুগে মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন উহা সাধারণ কলিযুগ নহে, উহা বিশেষ কোন যুগ যে সময়ে জনগণ স্বভাবতঃ হরিপরায়ণ। তদ্ভিন্ন শ্লোকান্তর্গত 'ভবিষ্যন্তি' (হইবেন) এই উক্তিদ্বারা পরবর্ত্তী কোন যুগ-বিশেষকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। সাধারণ কলিযুগ হইলে "ভবিষ্যন্তি" না বলিয়া 'ভবন্তি' (হয়েন) বলা হইত। সুতরাং পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন গৌরহরি প্রকটিত বর্ত্তমান অসাধারণ কলিযুগকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

এই অসাধারণ কলিযুগকে আরও বিশেষভাবে চিহ্নিত করিতেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বারা—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।।"

(ভাঃ ১১।৫।৩৮-৩৯)

—অর্থাৎ কোন কোন স্থানে এবং দ্রবিড়দেশে যেখানে তাম্রপর্ণী, বহুতোয়া কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং প্রতীচীনাম্নী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সকল স্থানের বহু ব্যক্তিই ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন। এখানে দ্রাবিড়াদি কতকগুলি স্থানকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ' উক্তিদ্বারা গৌড়, উৎকল প্রভৃতি কতকগুলি স্থানকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। দ্রবিড়দেশে শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের

আবির্ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্তপ্রকার বর্ণনাদ্বারা প্রচ্ছন্নাবতার গৌরভগবানের বর্ত্তমান কলিতেই যে আবির্ভাব তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাহারই আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রদূতরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব। তাঁহাদের আবির্ভাবের পরবর্ত্তিকালে পীতবর্ণে প্রচ্ছন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অন্য যুগের অদেয় উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ নামকীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়াছেন।

উপরি উক্ত শ্লোকসমূহে শ্রীকরভাজন বর্ত্তমান কলির উপাস্য ছন্নাবতার গৌরসুন্দরের নাম উল্লেখ না করিয়া ছন্নলক্ষণেই সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোক্ত বন্দনা শ্লোকেও ঐ ছন্নত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াসে কেবলমাত্র বিশেষণ দ্বারাই তাঁহাকেও নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"

—ভাঃ ১১। ৫। ৩৩

—অর্থাৎ হে প্রণতপাল (শরণাগতরক্ষক), হে মহাপুরুষ (পরতম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো), সদা ধ্যেয়, পরিভবঘ্ন (অন্যাভিলাষাদির পরাভব-কারী), অভীষ্টদোহ (কৃষ্ণপ্রেমরূপ অভীষ্টপূরণকারী), তীর্থাস্পদ (সর্ব্ব-তীর্থের কিংবা সর্ব্বভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ), শিব-বিরিঞ্চিনুত (শিবাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্মাবতার নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর দ্বারা স্তুত), শরণ্য (আশ্রিতগণের আশ্রয়), ভৃত্যার্ত্তিহর (নিজভৃত্য কুষ্ঠিবিপ্র বাসুদেবের দুঃখহারী), ভবাব্ধিপোত (মুমুক্ষা ও বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের লাভের পোতস্বরূপ) আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি। [এখানে 'মহাপুরুষ' শব্দের ব্যঞ্জনা এই—শ্রুতি বলিতেছেন "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্বেতা), এই শ্রুতিবাক্যের আদি ও অন্ত শব্দের সংযোগে মহান্ পুরুষ বা মহাপুরুষ

শব্দ—উহাতে মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রুতিবাক্যের আদি ও মধ্যশব্দের সংযোগে মহাপ্রভু শব্দটী।]

'সদা ধ্যেয়ং'—'ধীমহি' এই গায়ত্রীপদের প্রতিপাদ্য বস্তু; সদা—কালদেশনিয়মাদিবিচাররহিত।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্—
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।—ভাঃ ১১।৫।৩৪

—অর্থাৎ হে মহাপুরুষ (মহাপ্রভো শ্রীগৌরহরে) ধর্ম্মিষ্ঠ যে আপনি সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক, আর্য্যবাক্য পালনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং মায়ার অন্বেষণকারী জনগণের প্রতি দয়িতা হেতু অথবা দয়িতা (শ্রীরাধা) কর্ত্তৃক ঈপ্সিতা মায়ামৃগের (রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের) অনুধাবন করিয়াছিলেন, সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যানুযায়ী—মর্ম্মার্থ—ধর্ম্মিষ্ঠ—কৃষ্ণসেবনরূপ পরমধর্ম্ম যাঁহার মধ্যে অতিশয়িতভাবে বিদ্যমান থাকায় ধর্ম্মিশ্রেষ্ঠ। বহির্দৃষ্টিতে সন্ন্যাসগ্রহণছলে কৃষ্ণকীর্ত্তন-দ্বারা বৈধভক্তিধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যের লীলা যিনি অভিনয় করিয়াছেন এবং অন্তর্দৃষ্টিতে রাগাত্মিকা-ভাববতীদিগের শিরোমণি শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ ভাবের দ্বারা বিভাবিত হওয়ার জন্য যিনি ধর্ম্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

'সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা''—প্রাণাপেক্ষা দুষ্পরিহার্য্যা দেবগণ-বাঞ্ছিত-পদ লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অথবা—রাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণরূপা ভুক্তি ও জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যমিশ্রা মুক্তি পর্য্যন্ত, যাহা স্বর্গবাসী দেবগণও পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই অতিশয় দুস্ত্যজ বস্তুকেও তিনি পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া

জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 'আর্য্যবচসা অরণ্যং অগাৎ'—আর্য্যের (বিপ্রের) শাপবাক্য পালন করিবার ছলে যিনি চতুর্থাশ্রম যতিধর্ম্ম স্বীকার করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন।

'মায়ামৃগং দয়িতয়া ঈপ্সীতং অন্বধাবৎ'—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-রূপা বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ মায়ার অন্বেষণকারী কৃষ্ণেতর ভোগ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট জনগণের প্রতি অমন্দোদয়া দয়াপ্রযুক্ত যিনি নিজের অভীষ্ট প্রাণনাথ গোপীজনবল্লভ শ্যামসুন্দরের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। দয়িতয়া—দয়া আছে এই অর্থে দয়ী, তাহার ভাব দয়িতা— সেই হেতু (হেতু অর্থে ৩য়া)। মায়ামৃগং মায়াং মৃগ্যতি (অন্বিষ্যতি) যঃ স মায়ামৃগঃ তং প্রতি—মায়ামৃগদিগের প্রতি দয়িতা (প্রতি-যোগে ২য়া) অথবা—অন্যরূপ অন্বয়—"দয়িতয়া (শ্রীরাধয়া) ঈপ্সিতং মায়ামৃগং অন্বধাবৎ"—সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার পূর্ব্ব দয়িতা প্রেয়সী শ্রীরাধিকা রাধারমণকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই রাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া যিনি মায়ামৃগ শ্রীরাধারমণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

এখানে দয়িতয়া—দয়িতা (শ্রীরাধিকা)-দ্বারা (কর্ত্তরি ৩য়া), মায়ামৃগং-শ্যামসুন্দরং—অন্বধাবৎ ক্রিয়ার কর্ম্ম। [মায়া অর্থাৎ হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন, তখন যিনি সেই মায়াকে (শ্রীরাধিকাকে) অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই 'মায়ামৃগ' রাসবিহারী শ্যামসুন্দরকে যিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন।] সেই আপনার চরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি।

[রহস্যপূর্ণ উপরি উক্ত শ্লোকটিতে 'মায়ামৃগাদি' পদগুলি থাকার জন্য কোন কোন টীকাকার শ্রীরামাবতার পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় শ্রীরামাবতারের সঙ্কেত রহিয়াছে।]

কিন্তু শ্রীকরভাজন ঋষির "কলাবপি তথা শৃণু * *" (ভাঃ ১১। ৫। ৩১) উক্তিদ্বারা কেবল কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথাই

বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীরামচন্দ্র চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতায় অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকরভাজন-বর্ণিত কলিযুগ—অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ (লঘুভাগবত)। সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত হয় না। শ্রীরামাবতার-পক্ষেও বর্ণন সমর্থন করিয়া বলা যায় — হে মহাপুরুষ (মহাপ্রভু গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন), ধর্ম্মিষ্ঠ যে আপনি (শ্রীরামাবতারে) সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আর্য্যবাক্যে (পিতা দশরথের সত্য রক্ষার জন্য) বনগমন করিয়াছিলেন ইত্যাদি, সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। 'পরাবস্থ' অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবানের পরিপূর্ণ প্রকাশ অনুসারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিরূপিত— "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহারই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, সেজন্য গৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সকল অবতারের অবতারী বলা হয়। ছন্ন অবতারী শ্রীগৌরহরি যে শ্রীনৃসিংহদেবেরও অবতারী, উহা প্রহ্লাদোক্ত "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" এই উক্তিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গোক্ত ও কর-ভাজনোক্ত শ্লোকগুলির আলোচনা করা হইল।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তি

করভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে ঠিক তদ্রূপ মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন—

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।"

—অর্থাৎ যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদিরূপ) অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান [সঙ্কীর্ত্তন আদি (প্রধান) যাহার] পূজাসম্ভারদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া আশ্রয় করিয়াছি।

উপপুরাণের প্রমাণ—[অষ্টাদশপুরাণ ব্যতীত আরও অনেক পুরাণ আছে, তাহাদিগকে উপপুরাণ বলা হয়] শ্লোকটী এই—

"অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্।।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—'হে ব্রহ্মন্। (ব্যাসদেব), কোন কলিযুগে স্বয়ং আমিই (অহম্ এব—তাঁহার কোন স্বরূপ নহেন) সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাই।'

উহাতে বুঝা যাইতেছে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কোন এক কলিতে অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের যে দ্বাপরে তিনি ব্রজলীলা প্রকট করেন, তাহার ঠিক পরবর্ত্তী কলিতে (ব্রহ্মার এক কল্পে একবার) নিজেই জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক জীবকে হরিভক্তি প্রদান করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের প্রমাণ—

মহাভারতে দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।।"

—অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত এবং যিনি 'নিবৃত্তিপরায়ণ'।

বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে যে আটটী নাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেই আটটী নাম কয়েকটি শ্লোক হইতে সঙ্কলিত হইয়া উক্ত শ্লোকটী বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণ বর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী মহাপ্রভুর আদি লীলায় প্রযোজ্য। সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাপরায়ণ এই চারিটী নাম তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তী লীলায়

প্রযোজ্য। এই আটটী নাম ভগবানের অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ নামগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মহাভারতেও শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের কথা লিখিত আছে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হয় যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার না হওয়ায় কলিযুগেই তিনি অবতীর্ণ হন।

'সুবর্ণ বর্ণ'—পদটীর অর্থ এখানে স্বর্ণ বর্ণ নহে, কারণ পরবর্ত্তী 'হেমাঙ্গ' (হেম বর্ণ অঙ্গ যাঁহার) শব্দটী থাকায় একই স্থানে একার্থবোধক দুইটী শব্দ প্রয়োগ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সেজন্য উহার অর্থ এইরূপ হইবে যে—হরিনাম প্রচারকালে (কৃ+ষ্ণ=কৃষ্ণ) এই দুইটি উত্তম বর্ণ (অক্ষর) সর্ব্বদা বর্ণন অর্থাৎ কীর্ত্তন করেন, সেজন্য তাঁহার নাম 'সুবর্ণবর্ণ'। "হেমাঙ্গ" মহাপ্রভুর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল— সেজন্য 'হেমাঙ্গ' একটি নাম। 'বরাঙ্গ'—সাধারণ জীব অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গসমূহ বর (শ্রেষ্ঠ)—এজন্য একটি নাম 'বরাঙ্গ'। 'চন্দনাঙ্গদী'—মহাপ্রভু চন্দনের অঙ্গদ (বাহুভূষণ কেয়ূর) পরিধান করিতেন— সেজন্য একটি নাম 'চন্দনাঙ্গদ'। 'সন্ন্যাসকৃৎ'—মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সেজন্য একটী নাম 'সন্ন্যাসকৃৎ'। 'শম'—যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—"শমঃ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে"—শ্রীভগবানের উক্তি। 'নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"—নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্ত্তিপাদ)।

আগমশাস্ত্র প্রমাণ—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগমপুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ।" ভাগবত-প্রমাণ, মহাভারতপ্রমাণ, উপপুরাণের প্রমাণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আগম' (তন্ত্র) শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের "নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু"—এই শ্লোকে জানা যায় যে আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রেও মহাপ্রভুর পূজার বিধান উল্লিখিত আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণ

[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত শিষ্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ
প্রণীত 'সাধন নির্ণয়'-গ্রন্থোদ্ধৃত]

"কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথী-তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।"—পদ্মপুরাণ

'আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ধরাতলে মনোরম ভাগীরথী-তীরে শচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইব।'

"কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাম্।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু।।"

"অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।"

"কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারু-ব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ।।"—গরুড়পুরাণ

'কলিকর্ত্তৃক দহ্যমান জীবগণের পরিত্রাণের জন্য কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় দ্বিজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিব।'

'পূর্ণভগবদ্রূপী আমি কলিযুগের সন্ধিক্ষণে নবদ্বীপ মায়াপুরে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইব।'

'কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ গৌরবিগ্রহ ও সন্ন্যাসিরূপে দারু-ব্রহ্মের সমীপস্থ হইবেন।'

"শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীর-সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে।।"—বায়ুপুরাণ

'আমি কলিযুগে ভাগীরথীতীরে দীর্ঘকায়, শুদ্ধ ও গৌরবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া জীবদয়ানিবন্ধন তাহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তন উপদেশ করিব।'

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াৎ মায়ামানুষকর্ম্মকৃৎ।।"—স্কন্দপুরাণ

'অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দ্দেশে গৌরবিগ্রহ, অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র ও পার্ষদসমন্বিত আমি মায়ামনুষ্যের কর্ম্ম আচরণ-সহকারে শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।'

"কলৌ ঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ।।"—বামনপুরাণ

"হে নারদ! আমি কলিযুগে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরতমসাচ্ছন্ন, সদাচারবিবর্জ্জিত, সর্ব্বলোকের উদ্ধার করিব।"

'দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ-সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।।'

'অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা।।'—নারদীয়পুরাণ

'হে দেবগণ! আপনারা ভক্তরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হউন। আমি কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইব।'

'হে দ্বিজবর! আমিই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপে সর্ব্বদা (কলিযুগে) লোক রক্ষা করি।'

"আনন্দাশ্রুকলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণম্।।'

—ভবিষ্যপুরাণ

'হে তপোধন! কলিযুগে জীবগণ আমাকে আনন্দজনিত অশ্রুকলা ও রোমহর্ষযুক্ত এবং সন্ন্যাসিরূপী দর্শন করিবে।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
৭। সংকীর্ত্তনমালা (১ম ও ২য় ভাগ)
৮। জৈবধর্ম্ম
৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
১০। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
১১। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১২। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১৩। উপদেশামৃত
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও গৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২১। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বৃহদাকারে)
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (ছোট আকারে)
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বৃহদাকারে)
২৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত (ছোট আকারে)
২৭। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৮। একাদশী মাহাত্ম্য
২৯। দশাবতার
৩০। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩১। শ্রীল গুরুমহারাজের জীবনী (১ম-৩য় ভাগ)
৩২। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১ম স্কন্ধ-১২শ স্কন্ধ)
৩৩। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৪। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৫। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৬। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৭। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৮। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৯। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৪০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪২। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪৩। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৪। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৫। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৬। বেণুগীত
৪৭। গীতার প্রতিপাদ্য
৪৮। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (দুই খণ্ডে)
৪৯। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৫০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৫১। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা
৫২। বিরহ-বিধুরা
৫৩। স্তবগুচ্ছ
৫৪। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা
৫৫। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
৫৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
৫৭। ভগবৎ সাক্ষাৎকার
৫৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (ছোট আকারে) সম্পূর্ণ
৫৯। স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণের কারণ